Kaltithi by Mahmudul Khan

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com

কালতিথি

মাহমুদুল খান

---

www.MurchOna.com

পিপলস পাবলিকেশনস্, ৩৮ বাংলা বাজার

স্বত্ব
লেখক
প্রকাশকাল
২১ শে ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০২
প্রচ্ছদ

বর্ণ সংযোজন
পিপলস্ কম্পিউটারস্
৩৮ বাংলাবাজার
ঢাকা - ১১০০
মুদ্রণ
মুছা আর্ট প্রেস
৪১ হেমেন্দ্র দাস রোড
ঢাকা - ১১০০
মূল্য ৭০ টাকা

"Kaltithi" A Complete Novel,
written by Mahmudul Khan Mamun,
Published by Shadhin Prokash.
38/16 1st floor, Banglabazar, Dhaka-1100.
Bangladesh : Phone : 7118826, 7118771
E-mail : akash@sonalibangla.com
Price Tk. 70 only
$ 10 only

স্বাধীন প্রকাশ
প্রকাশক
এনামুল করিম খান বাবু
স্বাধীন প্রকাশ
৩৮, বাংলা বাজার (২য় তলা)
E-mail : Shadhin@proshikanet.com
পরিবেশক ঃ
আগামী প্রকাশনী, ৩৭ বাংলা বাজার
পরমা-হাক্কানী, মমতাজ প্লজা, ধানমন্ডী
জোনাকী, নর্থব্রুক হল রোড
পাঞ্জেরী পাবলিকেশনস্ লিঃ, ৩৮ বাংলা বাজার

উৎসর্গ
'আব্বাকে'
পুরোনো দিনের হয়েও যিনি
আধুনিক মনের মানুষ।

লেখকরাই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর

আলোচিত উপন্যাসের সুনির্বাচিত বিষয় ঘটনা নিয়ে তরুণ ঔপন্যাসিক মাহমুদুল খান তাঁর জোরালো ভাষা ও বাক্য বুননে 'কালতিথি'র কাহিনীকে প্রানবন্ত করে তুলেছে এবং এজন্যেই 'কালতিথি' পড়ার সময় পাঠক মন ছুঁয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

চিরাচরিত নিয়মের বাইরে নতুন নিয়মের ধারা সৃষ্টি করাই লেখকের ধর্ম। আজন্মই লেখককে অসত্যের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। দুষ্ট মনের অধিকারী লোক কোনোদিন লেখক হতে পারে না। তাই লেখকরাই যুগ-যুগান্তরের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। 'কালতিথি'র লেখক মাহমুদুল খান অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূখর এক তরুণ। তার এই সত্য প্রকাশের সাহসিকতাই ভবিতব্য বড় লেখকের প্রতিকৃতি।

বর্তমান বিশ্বে কথা সাহিত্যের কদর বেড়েছে। এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে প্রমানিত হয়েছে, কথা সাহিত্য মনের ভাব প্রকাশ ও জানবার বড় মাধ্যম। এই বড় মাধ্যমকেই অবলম্বন করে মাহমুদুল খান সাহিত্য ভুবনে বরণীয় স্মরণীয় হোক, এই প্রত্যাশা রইল।

অ াল মাহমুদ

লেখক পরিচিতিঃ

জন্ম ৩ এপ্রিল, ১৯৬৯ ঢাকায়। শৈশব কেটেছে টাঙ্গাইলের গ্রামের বাড়িতে। স্কুল, কলেজ ঢাকায়।

উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর আমেরিকা গমন।
ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, নর্থরীজ থেকে জৈব রসায়নে ব্যাচেলর ডিগ্রী লাভ। বর্তমানে ক্যানাডার টরন্টোতে
কর্মরত। কালতিথি তার তৃতীয় উপন্যাস।

॥ এক ॥

ভাই কি একবারেই যাইতেছেন, নাকি ছুটিতে? প্রশ্নকর্তার দিকে তাকায় দ্রোহী। বয়স বছর তিরিশেক। বেটেমত, মুখভর্তি দাঁড়ি, গায়ে টমি হিলফিগার টি শার্ট, জিন্সের প্যান্ট আর পায়ে একজোড়া কেড্স, নাইকি।

ভদ্রলোক দ্রোহীর দীর্ঘ বিমান যাত্রার শেষ অংশের সহযাত্রী। কুয়ালালামপুর বিমান বন্দর থেকে মিনিট দশেক হলো বিমানটি আকাশে ডানা মেলেছে। মালয়েশিয়া এয়ারের এই বিমানটিকে বিমান না বলে মুরগীর খোয়াড় বললে বেশ মানানসই হয়। সিটগুলো নড়বড়ে। সারা প্লেনে একটিমাত্র টিভি মনিটর। সেই টিভিতে এতক্ষণ বিমান ভ্রমণের যাবতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সতর্ক উপদেশাবলী প্রথমে মালয়েশিয়ান ভাষায় এবং পরে তার ইংরেজী তরজমা করে যাত্রীদের শোনানো হলো। তবে দ্রোহী বা তার সহযাত্রী যেখানে বসে আছে সেখান থেকে টিভি মনিটর দেখা যায় না।

যাক বাবা একদিক থেকে রক্ষা। গত তিনদিন যাবত একই জিনিস দেখতে দেখতে বিরক্তি একেবারে চরম সীমা।

বিমানের এয়ারকন্ডিশনিং মনে হয় কাজ করছে না। ভেতরে ভাপসা গরম। আশ্চর্য্য! লসএঞ্জেলেস থেকে কুয়ালালামপুর পর্যন্ত বিমানের যে সার্ভিস তার সাথে কুয়ালালামপুর টু ঢাকার সার্ভিসের আসমান জমিন তফাত। কুয়ালালামপুর বিমান বন্দরে আর এই বিমান ভর্তি যাত্রীদের করুণদশার কথা ভাবে দ্রোহী। সে তুলনায় সে নিজে অনেক অনেক ভাগ্যবান। গরু ছাগলের মত ব্যবহার অন্তত তাকে পেতে হয় না।

- আমি একেবারেই যাইতাছি। পেটেভাতে বিদেশ থেকে পোষায় না। থাকলাম তো তিন বছর। এখন দেখি দ্যাশে যাইয়া ডাইল ভাতের কোন রকম ব্যবস্থা করা যায় কি না।

সহযাত্রী তার প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে নিজেই নিজের বৃত্তান্ত বলতে শুরু করে দেয়।

মায়া হয় দ্রোহী লোকটির জন্য। ভদ্রলোক হয়ত তাকেও মালয়েশিয়া ফেরত ভেবেছে। থাক ভাবুক। লোকটির ভুল সে ভাঙ্গানোর চেষ্টাও করে না। ভুল ভাঙ্গালে হয়ত সারাটা ক্ষণ লোকটি তার ভাগ্যকে দোষারোপ করবে। দুঃখী মানুষকে সান্তনা

দিতে হলে নিজেকেও দুঃখী হিসেবে উপস্থাপন করতে হয়। দুঃখী মানুষের সমব্যাথী কেবলমাত্র আর একজন দুঃখী মানুষই হতে পারে।

X আমিও একেবারেই যাইতাছি। যেই বেতন দেয় তার চেয়ে দ্যাশে অনেক ভাল। একই পথের যাত্রী পেয়ে লোকটির চেহারায় অপেক্ষাকৃত প্রশান্তির আলো উদ্ভাসিত হয়। বিপুল উৎসাহে ভদ্রলোক তার কাহিনী বর্ণনা করতে থাকে। সেই যে বিদেশ আসার আগে জমিজমা বিক্রি থেকে শুরু। তারপর একে একে আদম ব্যাপারীর টালবাহানা, বিদেশের মাটিতে পা দিয়েই শ্রীঘর বাস, মাস তিনেক পর মুক্তি পেয়ে এক কারখানায় পেটেভাতে কাজ। দীর্ঘ এক বছর। এক বছর পর সাময়িক মুক্তি ---- তারপর --- আর কতকি। লোকটির কাহিনী শেষ হবার আগেই খাবার আসে। কথা বন্ধ করে খাওয়ায় মনযোগী হয় সহযাত্রী।

দ্রোহীর পেটটা তেতে আছে। কিন্তু খেতে মন চাইছে না। খাবারে মনযোগ না দিয়ে একটু চোখ বোজার চেষ্টা করে সে।

হায়রে সুখ। একটু খানি সুখের জন্য, একটুখানি ভাল থাকার জন্য মানুষ নিজের দেশ, ভিটামাটি, আত্নীয়-পরিজন ফেলে পাড়ি জমায় দূরদেশে। সুখের মাটি ছোঁয়ার ভাগ্য আবার সবার হয় না। সাগরে মাছ ধরার ট্রলারে, মালবোঝাই ট্রাকে, অথবা গভীর অরণ্যে বিষাক্ত সাপের দংশনে নীল হয়ে সুখের চিরনিদ্রায় শায়িত হয় অনেকে। আবার অনেকে সক্ষম হয় সেই মাটি ছুঁতে।

কেউ বা এক সাগর পাড়ি দেয় আবার কেউ বা সাত সাগর আর তের নদী পাড়ি দেয় দ্রোহীর মত। তারপর শুরু হয় যুদ্ধ। ভাল থাকার যুদ্ধ। সুখে থাকার যুদ্ধ। প্রিয়জনের মুখের হাসি কল্পনার মানস চক্ষে অবলোকন করার জন্য যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ আর সুখ পরস্পর বিরোধী দুটো শব্দ। একজন তেল তো অন্যজন পানি। মিশ খায় না কখনও। পাশের লোকটির সংগে দ্রোহীর গুণগত কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য যা আছে তা শুধু বাহ্যিক। দুজনের সুখ বা দুঃখ, জীবনের লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধ দুই ভিন্ন ফ্লেভারের। ইন গ্রেডিয়েন্ট এক মোড়ক ভিন্ন। কেউ সুখী না। দ্রোহী সুখী না, তার সহযাত্রী সুখী না। বিমান ভর্তি যাত্রীরা কেউই সুখী না। বিমান বন্দরে ফেলে আসা সেই করুণ জীর্ণদশার লোকগুলো সুখী না। অথবা রবীন্দ্রনাথের সেই কিনু গোয়ালার গলি ---- আমি ছাড়া ঘরে থাকে আর একটা জীব --- এক ভাড়াতেই --- সেটা টিকটিকি।

তবে মানুষ আদ্যপান্ত সুখী না হলেও কখনও কখনও, কালে ভদ্রে সুখী হয় বটে। এই যেমন দ্রোহী এই মুহূর্তে সুখী। ভীষণ রকমের সুখী। আর মাত্র দু'ঘন্টা পরে সে ফেলে আসা অতীতকে হাত দিয়ে ছুঁতে পারবে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারবে। চাইলে দ্রবীভূত করে দিতে পারবে নিজেকে ফিরে পাওয়ার অনাবিল আনন্দের বাড়াবাড়ি রকমের সুখে।

দশ বছর? একত্রিশ কোটি তিপান্ন লক্ষ ষাট হাজার সেকেন্ড আবার সেই পুরনো গন্ধ, বর্ণ, পরিচিত নগর আর তার নাগরিক। জিয়া বিমানবন্দর থেকে এয়ারপোর্ট রোড হয়ে মহাখালী, মহাখালী থেকে সাতরাস্তা হয়ে ফার্মগেইট, ফার্মগেইট থেকে গুলিস্তান হয়ে নবাবপুর রোড ধরলেই পুরনো ঢাকা। পুরনো ঢাকার এক অচেনা, অখ্যাত, নোংরা পূতিগন্ধময় গলিতে প্রায় শত বছরের পুরনো তামাদি হয়ে যাওয়া এক বাড়ি। এই শহরের গোড়া পত্তনে এই বাড়িটির অথবা এই বাড়ির মানুষগুলোর কোন ভূমিকা নেই। ভূমিকা সেই রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে, ধর্মে অথবা অধর্মে। এসব দিক বিবেচনা করলে এই বাড়িটি বা বাড়ির মানুষগুলোর কোন মূল্যই থাকতে পারে না। কিন্তু দ্রোহীর বিবেচনায় সেই বাড়িটি বা বাড়ির মানুষগুলোর মূল্য মনুষ্য সৃষ্ট কোন মুদ্রা বা একক দিয়ে নিরুপণ করা সম্ভব না।

একান্ত আপনজন বলতে দ্রোহীর বৃদ্ধা মা, বড় ভাই ধ্রুব, ভাবী মেঘলা, বোন লিপি আর ভাগনী তুলতুল। তুলতুল নামটার পেছনে ছোট একটা ইতিহাস আছে। ন্যাশনাল হাসপাতালে তুলতুলের যখন জন্ম হয়, তখন লেবার রুম থেকে বেরিয়েই মেঘলা আনন্দে চিৎকার করতে করতে বলে ওমা বড় আপার কি সুন্দর একটা মেয়ে হয়েছে। একদম পুতুলের মত। ব্যাস নাম হয়ে গেল পুতুল। পুতুল যখন বিছানায় শুয়ে হাত পা ছুড়ে খেলে আর খিলখিল করে হাসে, তখন সবাই ওর নরম তুলতুলে গাল টিপে আদর জানাতো। ফলে জন্মের সময় দেয়া পুতুল নামটার বিবর্তন ঘটে হয়ে যায় তুলতুল। দ্রোহী যখন দেশ ছাড়ে, তখন পুতুল টুকটুক করে বাড়ীময় হাঁটে আর তোতা পাখীর মত কথা বলে। সেই পুতুল এখন কলেজে পড়ে। অবশ্য গত দশ বছরে আরেক জন ----

X লেডিজ এ্যান্ড জেন্টেলমেন ----- স্বীকারে পাইলটের কণ্ঠ আর সেই সাথে সীটবেল্ট অনের সাইন জ্বলে ওঠে। বিমানটা অসম্ভব রকমের ঝাঁকুনি খাচ্ছে। যাত্রীদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন। পাইলট এতক্ষণ যে ঘোষণা দিল তার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় ভদ্রমহিলা এবং মহোদয়গণ। কোন এক অজানা কারণ বশতঃ বিমানটির একটা ইঞ্জিন বিকল হয়ে গ্যাছে। তবে অরৎনঁং অ ৩০০-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এর একটা ইঞ্জিন বিকল হলেও বাকীটা দিয়ে নিরাপদে ল্যান্ড করা সম্ভব। আমরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের আকাশ সীমায় প্রবেশ করেছি। আর মিনিট দশেকের মধ্যে বিমান বন্দরের রানওয়ে দেখতে পাব। এ সময় বিমানটি প্রচন্ড ঝাঁকুনি খেতে পারে। তবে আপনারা চিৎকার চেচামেচি না করে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকুন যাতে আমরা নিরাপদে অবতরণ করতে পারি। আমরা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারের সংগে অনবরত যোগাযোগ রাখছি। আপনারা যার যার আসনে সীট বেল্ট বেঁধে নিরাপদে বসে থাকুন। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন। হ্যা ঈশ্বর। শেষ --- সব শেষ। সমস্ত আশা-ভরসা, স্বপ্ন, বাস্তবতা, মান-অভিমান, প্রেম-ভালবাসা, যুদ্ধ এবং শান্তি। সবকিছুর সলীল সমাধান ঘটতে যাচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। পাইলট যতই বলুক যে, এ ইঞ্জিনে ভর করে প্লেনটি ল্যান্ড করতে পারবে, আসলে সব বাক ওয়াস। মৃত্যুর আগে বেঁচে থাকার শেষ যুদ্ধের মিথ্যা আস্ফালন। বিমানের প্রতিটি যাত্রীর মধ্যে স্পষ্ট মৃত্যুর ভয় দেখতে পায় দ্রোহী। আটসাট করে সীট বেল্ট বেঁধে, দুই হাতে চেয়ারে হাতল ধরে বসে আছে সবাই। মুখ থেকে

বুলেটের মত ছুটছে দোয়া দরূদ, যে যা পারে। সামনে মৃত্যু দূত আজরাইল। বেঁচে থাকার প্রাণান্ত আকাংক্ষায় মানুষগুলো যেন দোয়া দরূদ নয়, আজরাইলকে অবিরাম তিরস্কার করছে। পিছু হটে নাও আজরাইল, আমরা মরতে চাই না। অন্ততঃ এখনই না। সেই যে বাসর রাতে প্রিয়তমার লজ্জা রাঙা মুখটা দেখেছিলাম, সে যে কি লজ্জা। আমি আমার লজ্জা রাঙা প্রিয়তমার মুখটা শেষবারের মত দেখতে চাই। আমার দু'বছরের মেয়েটা এখনও তার বাবাকে দেখেনি। আমি আমার মেয়ের মুখ থেকে একটা বার বাবা ডাক শুনতে চাই। ঘুম পড়ানি গান শুনতে শুনতে, নিশ্চিন্তে, আরামে, শান্তিতে একটু ঘুমাতে চাই। আমরা মরতে চাই না। এখনই না।

ঝাকুনি আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। প্রচন্ড বেগে বাতাসের ঝাপটা এসে যান্ত্রিক পাখিটার বিশাল বক্ষে আঘাতের পর আঘাত হানছে। সেই সাথে গর র গরং বিকট শব্দ। এইতো এখনই হয়তো একটা ডানা খসে পড়বে পাখিটার, তারপর আর একটা, তারপর? সব শেষ। সব।

হে আল্লাহ্, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা এবং বিচার দিনের প্রভু। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মদ (সঃ) তোমার প্রেরিত বান্দা এবং শেষ নবী। তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। তোমার দরবারে শোকর জানাই - কদিনের জন্য হলেও পৃথিবীতে মানুষ রূপে জন্ম দেবার জন্য। আমার এই ছোট্ট জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যত অন্যায় করেছি, সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে - তার সব তুমি ক্ষমা করে দাও। মাটি থেকে তৈরী করেছ আমায় আবার মাটিতে মিশিয়ে দেবে এটাই সত্য। সেই ধ্রুব সত্যকে গ্রহণ করার জন্য আমি প্রস্তুত। আমি প্রস্তুত প্রভু।

অসম্ভব হালকা লাগছে শরীর। মৃত্যুর আগে কি শরীর হালকা লাগে? কে জানে। মনে হচ্ছে প্লেনটি নীচে নামছে। হ্যা তাইতো। একেবারে যাকে বলে ফ্রী ফলিং। গাছ থেকে আপেল সরাসরি মাটিতে পড়ে নিউটনি শক্তির গুনে। আপেল পড়ে পাঁচ, সাত, দশ ফুট ওপর থেকে। আর এটা এখন পড়ছে পাঁচ, সাত হাজার -----

অপাস --- বুম ---- ক্যা র র র র । সো সো সো ----

মাটি ছুয়েছে চাকা। হ্যা এইতো স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে। ঘর র র। সো সো সো, ক্যার র র।

আরও কয়েক মিনিট চলে এরকম। বিমানভর্তি যাত্রীদের বেঁচে থাকার তীব্র চাহিদাই হোক, দোয়া দরূদের ধারালো আক্রমণেই হোক, বিমান প্রস্তুতকারীদের কারিগরি কারসাজিতেই হোক, আর বিমান চালকের দক্ষতার জোরেই হোক, আজরাইলের ওপর আল্লাহ্ তায়ালা অন্তর্বর্তিকালীন নিষেধাজ্ঞা জারী করায় আজরাইল পিছু হটতে বাধ্য হয়। বিমানটি যখন পুরোপুরি থেমে যায়, ভেতরে তখন একেবারে নিস্তব্ধ। কারো মুখে টু শব্দটি নেই। অল কোয়ায়েট অন দ্য কুর্মিটোলা রানওয়ে।

এই জগতে বেঁচে থাকার যত আনন্দ আছে তার সবটুকু লুকিয়ে আছে শুধু শ্বাস নেওয়া এবং শ্বাস ছাড়ার মধ্যে। অক্সিজেন নেওয়া, কার্বনডাইঅক্সাইড ছাড়া। ব্যাস। আর কিছু না। অক্সিজেন আর কার্বনডাইঅক্সাইডের এই লেনদেনের পেছনে রয়েছে এক মহাপরিচালকের হাত। যতক্ষণ এই লেনদেন সচল থাকে ততক্ষণই প্রতিটি মানুষের উচিত সেই পরিচালকের প্রতি শোকরিয়া আদায় করা। অন্য কিছুর প্রতি কারও কোন মোহ থাকা উচিত নয়। কিন্তু যা উচিত, মানুষ তা করে না। মৃত্যু উপত্যকা থেকে ঘুরে আসা এই বিমানটির যাত্রীরাও এর ব্যতিক্রম না। শুধু নিঃশ্বাসটুকু সচল রাখার জন্য এতক্ষণ যে মানুষগুলোর আকুল মিনতি ছিল, সেই মানুষগুলোই মুহূর্তে অশান্ত হয়ে ওঠে। হুড়মুড়িয়ে ইমিগ্রেশনের সামনে লাইনে দাঁড়ানো। ইমিগ্রেশন পার হয়ে লাগেজ বেল্টের চার ধারে হুমড়ি খেয়ে পড়া। সেই সাথে চিৎকার চেচামেচি। তবে তার মাত্রাটা অতটা জোরালো না। দ্রোহীও এসবের বাইরে না। বেঁচেই যখন আছে, তখন আর খামোখা লাগেজগুলো এখানে ফেলে রাখা কেন?

খুব বেশি দেরি হয় না। প্রথম কিস্তিতেই দ্রোহীর লাগেজ দুটো বেল্টে আছড়ে পড়তে দেখা যায়। মরচে ধরা প্রায় অচল ট্রলিতে লাগেজ দুটো তুলে কাস্টম্-এর দিকে হাটা শুরু করে সে। ইতিমধ্যে দু'চারজন এসে ঘ্যানর ঘ্যানর করেছে। ভাই কোন সাহায্য লাগবে নাকি? কোন জোর জুলুম নাই। যা খুশী দিয়েন। এ ব্যাপারে স্যাম বারবার সাবধান করে দিয়েছে। কাজেই দ্রোহী এদের কথায় কর্ণপাত করে না।

এতবড় একটা দুর্ঘটনা থেকে যাত্রীরা রক্ষা পেয়েছে ভেবেই হয়ত কাস্টমস অফিসাররা যাত্রীদের সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে গ্রহণ করছে। দ্রোহীকে লাগেজ খুলতে হলো না। নির্বিঘ্নে কাস্টমস্-এর বৈতরনী পার হয়ে এলো সে।

কিন্তু মুশকিল হলো বাইরে এসে। মৌমাছির মত চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো ট্যাক্সি ড্রাইভার, স্কুটার ড্রাইভার আর সেই সাথে ডলার ভিক্ষুক। কেউ ট্রলি ধরে তো আরেজন হ্যান্ড ব্যাগ। একজন হাত ধরে টানে তো আর একজন গলা ধরে ----

কি যন্ত্রণা গলা ধরেন কেন ভাই? বিরক্তি ভরে তাকায় দ্রোহী গলা ধরা ব্যক্তিটির দিকে।

হা হা হা। কি অবস্থা দোস্ত?

হাবিব? ক্যামন আছিস দোস্ত? জড়িয়ে ধরে দ্রোহী হাবিবকে। সে যে দেশে আসছে তা একমাত্র হাবিবই জানে। হাবিব হচ্ছে দ্রোহীর ছোটবেলার বন্ধু। পেটের তাগিদে এখন ট্যাক্সি চালায়।

হাবিবের আগমনে মৌমাছির দল একে একে সরে পড়ে অন্য যাত্রীদের উদ্দেশ্যে।

মাঝরাতের আঁধার ভেদ করে হাবিবের ট্যাক্সি এয়ারপোর্ট রোড ধরে ছুটে চলে। আলো আঁধারির লুকোচুরিতে আবাক হয়ে রাস্তার দুপাশে ইতিউতি তাকাচ্ছে দ্রোহী। বহুদিনের পুরাতন আর পরিচিত এই প্রাণের শহরটিকে ক্যামন যেন অচেনা অচেনা লাগছে তার কাছে।

॥ দুই ॥

টুপ টুপ টুপ। টিনের চালে শিশির পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় দ্রোহীর। এ এক অপূর্ব সঙ্গীতের ম র্ছনা। দীর্ঘ দশ বছর এই সঙ্গীতের মাধুরী থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছিল দ্রোহী। দ্রোহীদের হেমেন্দ্র দাস রোডের বাড়িটা বেশ পুরোনো। বছর চল্লিশেক তো হবেই। সেই পাকিস্তান আমলে কেনা। দ্রোহীর অবৈষয়িক পিতার মাথায় ঢাকা শহরে একটা বাড়ি করার মত বৈষয়িক চিন্তাটা নিশ্চয়ই মা ঢুকিয়েছিলেন । বাবার স্মৃতি খুব একটা মনে পড়ে না দ্রোহীর। অস্পষ্ট ধোয়া ধোয়া। সরকারী চাকুরী করতেন ভদ্রলোক। কৃষি মন্ত্রানালয়ে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাবা আসার সময় বিস্কুট নিয়ে আসতেন। খুব সুন্দর একটা গন্ধ সব সময় ছড়াতো বাবার চারিদিকে। সম্ভবত নাবিস্কো বিস্কুট। সেই গন্ধের জন্যই হোক অথবা বিস্কুটের লোভেই হোক বাবা আসার সময় হলে দ্রোহী দরজার আশপাশেই ঘোরাঘুরি করত। একদিন বাবা গেলেন সরকারি কাজে ঢাকার বাইরে। ফিরে আসার কথা ছিল দু'দিন বাদেই। দু'দিনে ফেরেননি বাবা ফিরেছিলেন চার দিনের দিন লাশ হয়ে। ঢাকা আরিচা মহাসড়কের বলিদান। বাবার পকেটে কি তখনও নাবিস্কো বিস্কুটের প্যাকেট ছিল? ছিল হয়ত। কিন্তু সে সময়ে চা জাতীয় তীব্র গন্ধে ভরা ছিল বাবার আশপাশটা। ব্যস এই টুকুই। প্রায় দুই যুগ আগের কথা। আরও নিশ্চয়ই অনেক স্মৃতি আছে বাবার সাথে দ্রোহীর । কিন্তু ওগুলো মনে পড়ে না। মানুষের স্মৃতি এক আজব বস্তু। এই আছে এই নাই। একজন মানুষের জীবনে জন্মের পর থেকে যত কিছু ঘটে তার প্রতিটি দৃশ্য যদি সেলুলয়েড ফিতায় বন্দী করে রাখা যেত, তাহলে অসাধারণ, অতি চমৎকার একটা সিনেমা হতো। অবশ্য এ সব কিছুই এক জনের ক্যামেরায় বন্দী করা আছে। দ্রোহীর মনে একটা সুপ্ত বাসনা আছে। যদি সে কখনও বেহেশতে যায় তবে আল্লার কাছে সে একটা আব্দার করবে। ফেরেশতারা যখন তাঁকে বলবে ঃ

X বলুন, আপনার বিনোদনের জন্য কি করতে পারি? তখন সে বলবে, আমি আমার নিজের মুভি দেখতে চাই। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি। না না ভুল হল জন্ম না এক্কেবারে ভ্রূণ অবস্থা থেকে শুরু। মানস চক্ষে ভেসে উঠবে কত শত হাজার বছর আগের দৃশ্য। একের পর এক। হয়ত বা দশ সেকেন্ডের ফিচার ফিল্ম। বেহেশতের সময় নির্ণয়ের একক কি আর সেকেণ্ডের? কে জানে।

বাবা এখন কি করছেন? উনি কি নিজের ফিচার ফিল্ম দেখছেন? নাকি তার অবর্তমানে এই নাট্যশালায় যা ঘটছে তাই দেখছেন।

তাঁর জীবদ্দশায় গড়ে ওঠা এই বাড়িটা ঠিক তেমনি আছে। পেছনের অংশে দোতলা দালান আর সামনে এক তলা, ওপরে টিনের চাল। বাড়ির দেয়ালগুলো অনেক পুরু। আর মাথা থেকে ছাদের উচ্চতা কমপক্ষে পনেরো ফিট তো হবেই। আজকালের বাড়ির মত হাত দিয়ে ছাদ ছোঁয়া যায় না। দ্রোহীর মনে পড়ে, যখন ঘরের ফ্যান নষ্ট হত অথবা টিউব লাইটের কোন অংশ নষ্ট হত তখন বিশাল তাল গাছের মত লম্বা একটা টুল এনে তার ওপর দাঁড়িয়ে কাজটা সারা হত। এখনও কি সেই টুলটা আছে? আছে হয়ত।

দ্রোহীদের বাড়িটা দক্ষিণ দিকে মুখ করা। পাশটা একেবারে সরু। দ্রোহী যে ঘরটায় এখন শুয়ে আছে সেটা একেবারে দক্ষিণে। ঘরের দক্ষিণে একফালি বারান্দা, ওপরে ঢালু করে দেয়া টিনের চাল। বারান্দার রেলিংগুলো মজবুত করে তৈরী। সেগুন, গর্জন এই জাতীয় কোন কাঠের। ঘরটির উত্তরে পর পর দুটো ঘর। প্রতিটি ঘরের ভেতরের দরজা দিয়ে অন্য ঘরে যাওয়া যায়। পূর্ব দিকে আরেক ফালি সরু বারান্দা দক্ষিণের বারান্দার সঙ্গে মিশে গ্যাছে। বারান্দায় বের হবার জন্য প্রত্যেক ঘরের সাথে একটি করে দরজা আছে। আর পশ্চিমে পুরু দেয়াল। দেয়ালের ওপাশে অন্য জনের বাড়ি। পশ্চিম পাশের বাড়িটি ছিল হিন্দু টাইপের পুরোনা বাড়ি। রাতে আসার সময় দেখেছে দ্রোহী, সিদ্দিক সাহেবের বাড়িটি আর পুরোনো নেই। তাল গাছের মত উচু দালান উঠে গ্যাছে। সিদ্দিক সাহেবের বাড়ির সামনে একটা নাম ফলক ছিল ডঃ সিদ্দিকুর রহমান (ছিদ্দিক) এম বি বি এস। ভদ্রলোক ডাক নামের মায়া ছাড়তে পারেনি। নাম ফলকটা এখনও আছে নাকি দিনের বেলায় দেখতে হবে।

চটপ চটপ চটপ করে একটা শব্দ আসে পূর্ব দিকের বারান্দা থেকে। স্যান্ডেল পায়ে কারও হাটার শব্দ। শব্দটি দ্রোহীর পরিচিত। শব্দটি দ্রোহীর ভাবী মেঘলার হাটার শব্দ। মেঘলার সব সময়ের প্রিয় ছিল মোঘল চপ্পল। আর স্যান্ডেল পায়ে এরকম শব্দ করে হাটা। আশ্চর্য! দশ বছরে একদম পরিবর্তন হয়নি। মনে মনে হাসে দ্রোহী।

কর র র করে দরজা খোলার শব্দ হয়। দরজার কব্জিতে গ্রীজের ঘাটতি হয়েছে। দরজা খুলে মেঘলা উঁকি মারে। একই সাথে মশারীর নীচ থেকে মাথা বের করে দ্রোহী।

X এস ভাবী।

X এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙ্গে গেল? রাতে ঘুম হয়েছিল তো? মশা কামড়ায়নি তো?

তিনটা প্রশ্ন এক সাথে করে মেঘলা। কাল রাতে আসার পর থেকেই লক্ষ্য করছে দ্রোহী তাকে সবাই যেন ক্যামন তোয়াজ করে কথা বলছে। সবাই বলতে ভাবী আর মা। এছাড়া বড় ভাই ধ্রুব আর বড় বোন লিপির সঙ্গে এখনও দেখাই হয়নি।

X তুমি একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করলে উত্তর দিই কিভাবে বলো?

X না বলছিলাম কি আমেরিকা থেকে আসলে তো দিন রাত্রির পার্থক্যের জন্য ঘুমের ব্যাঘাত হয়। তা তোরও - -

X এইতো আরেকটা প্রশ্ন করলে। দয়া করে মশারীটা একটু খোল। এমনভাবে মশারী টানিয়েছো যে কোথা থেকে খুলব বুঝতেই পারছি না। খাটে স্ট্যান্ড নেই কেন?

X আজকাল খাটে আর কেউ স্ট্যান্ড ব্যবহার করেনা। মশারীর দড়ি খুলতে খুলতে উত্তর দেয় মেঘলা। ঘুম যখন ভেঙ্গেছেই মুখ হাত ধুয়ে নাস্তা করবি চল।

X কি নাস্তা?

X পরোটা মাংস, ডিম।

X ভাবী এখানে একটু বসো তো। শোয়া থেকে উঠে পাশে রাখা টি শার্ট পরতে পরতে বলে দ্রোহী।

X তোর এখনও খালি গায়ে শোয়ার অভ্যেস যায়নি?

X আগে এইখানে বসো তো। তোমাকে একটু দেখি। কোমরে আঁচল পেছিয়ে খাটের কিনারে বসে মেঘলা। আমাকে আর কি দেখবি। আমি তো বুড়ি হয়ে গেছি। সামনে বসা মেঘলার দিকে তাকিয়ে থাকে দ্রোহী।

X যাহ, তুমি সেই আগের মতই সুন্দর আছো ভাবী।

X তেল মারিস না ভাই।

X তেল না সত্যি বলছি। এবারে বলতো ভাবী বাসায় এরকম নাস্তা কি প্রতিদিনই হয়?

X না।

X তাহলে আজকে কেন হলো?

X বারে তুই এসেছিস।

X নিজেকে কালকে রাত থেকে কেমন যেন অতিথির মত লাগছে। তোমরা আমাকে পর পর চোখে দেখছ।

X শুধু আমরাই দেখছি? তুই দেখছিস না?

বোকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দ্রোহী।

X বুঝলাম না।

X তুই আমাকে আগে কি বলে ডাকতিস মনে পড়ে? যেন কঠিন এক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে দ্রোহী। মাথা চুলকাতে থাকে সে। স্মৃতির মহাশূণ্যে থ্রি ডি মোশনে ঘুরপাক খেতে থাকে দ্রোহী। দশ বছর পেছনে ফিরে পথ হারিয়ে ফেলেছে সে।

মনে পড়ছে না, না?

ডান বায়ে মাথা নাড়ে দ্রোহী।

X তুই আমাকে ভাবী বলে ডাকতিস না। ডাকতিস মেঘবতী বলে।

X ও হ্যাঁ। লজ্জা পেয়ে মথা নীচু করে দ্রোহী।

বয়সে মেঘলা দ্রোহীর বছর তিনেকের বড় হবে। বড় ভাইয়ের বউ অথবা বয়সের ব্যবধান এ দু'টোর কোনটাই ওদের দু'জনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। দ্রোহীর মধ্যে ছিল অফুরন্ত প্রাণ। সমস্ত বাড়ির মানুষ এমনকি বাড়ির বেড়ালটাও ছিল দ্রোহীর ন্যাওটা। খোলামেলা, সব সময় হাসি খুশি আর বিশাল একটা অন্তরের অধিকারী প্রায় সমবয়সী এই দেবরটিকে বন্ধু হিসেবে মেনে নিতে বেশী বিলম্ব করেনি মেঘলা। অন্যদিকে মেঘলার মধ্যে কিছু কিছু উপন্যাসিক গুন আছে। চোখে, মুখে, স্বভাব আর কথা বার্তায় এমন একটা ছন্দ আছে যা শুধু কাছে টানতে জানে, আপন করে নিতে বলে। দ্রোহী বিদেশ যাবার আগ পর্যন্ত এ বাড়ির কারও সাথে মেঘলার ঝগড়া হয়েছে অথবা আত্মীয় মহলে মেঘলার আচার ব্যবহারে কেউ রুষ্ট হয়ে কান কথা বলেছে এমনটি মনে পড়ে না দ্রোহীর। এত মধুর সম্পর্ক থাকলেও দু'জনের মধ্যে অদৃশ্য দেয়াল ঠিকই ছিল। আভিজাত্য সে দেয়ালের ভিত আর ব্যক্তিত্ব হচ্ছে তার গাঁথুনি। সমবয়সী বা অধিক ভাবীদের সঙ্গে অনেকেই একটু আধটু অথবা বাড়াবাড়ি রকমের আদি রসাত্মক রসিকতা, একটু চটুল ইয়ার্কি করে থাকে। কিন্তু দ্রোহী আর মেঘলা, মাঝ খানে অদৃশ্য অথচ মজবুত দেয়াল।

X ভাইয়া আসেনি এখনও?

X এসেছে। কিন্তু এসেই ঘুম। তুই উঠলে অবশ্য ডাক দিতে বলেছে।

রান্না ঘরটার চেহারা অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে গ্যাসের চুলা মেঝের প্রায় সমতলে ছিল। আর এখন চুলা দুটো উচুতে তোলা। কাটনা কুটনির জন্য বটির সেই সাবেকি ব্যবহার পূর্ববৎ অব্যাহত থাকলেও সাথে সংযোজন হয়েছে আধুনিক ব্যবস্থা। চুলার সমান্তরালে কোমর সমান উঁচু সিমেন্টের বেদী তৈরী করা হয়েছে দাঁড়িয়ে কাটাকুটি করার জন্য। পরোটা ভাজছিল সালমা বেগম। পেছন দিক থেকে এসে জড়িয়ে ধরে দ্রোহী মাকে।

X মা। মাগো।

ছেলের অস্তিত্ব টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়ায় সালমা বেগম। ছেলের মাথায়, চুলে, গালে হাত বুলায়।

X ঘুম হয়েছিল ঠিকমত?

X হ্যাঁ হয়েছিল।

X চল বাবা টেবিলে চল। নাস্তা করে আবার একটা ঘুম দিয়ে দে।

খাবার টেবিলে ধ্রুবর সঙ্গে দেখা হয় দ্রোহীর। দু'ভাই জড়িয়ে ধরে পরস্পরকে। দ্রোহীর কানের কাছে ফিস ফিস করে বলে ধ্রুব।

X মার্লবোরো সিগারেট এনেছিস?

X ডাক্তার মানুষ হয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলছ কেন ভাইয়া। মেঘবতীকে বলে দিব? হাসতে হাসতে উত্তর দেয় দ্রোহী।

X কি ব্যাপার দু'ভায়ে কি গোপন পরামর্শ হচ্ছে। রান্না ঘর থেকে পরোটার প্লেট হাতে উদয় হয় মেঘলা। গরম ভাপ উড়ছে প্লেট থেকে।

X কি বলে দেবো?

X না না খবরদার। ভায়ের মুখ চাপা দেয় ধ্রুব। প্লেট নামাতে নামাতে ভ্রুকুটি করে তাকায় মেঘলা। তার পর আস্তে আস্তে বলে ঃ

X আমি জানি তুমি ওর কাছে কি চাইছিলে। বিদেশী সিগারেট, তাই না?

জিবে কামড় দেয় ধ্রুব। আরে ছি ছি ---।

হঠাৎ সালমা বেগমের আগমনে এ প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে যায়।

X তোর জন্য বোতলের পানি আনতে পাঠিয়েছি। এই পানি খাস না। ছোট ছেলের প্লেটে মাংস তুলে দিতে দিতে বলে সালমা বেগম।

X আরে ধ্যাৎ। কিযে বলেন। এই মাটিতে জন্ম, যেন এই মাটিতেই মরি। বাসার সবার যদি এই পানিতে চলে তবে আমার চলবে না কেন? সামনে রাখা পানির গ্লাস বা হাতে নিয়ে ঢক ঢক করে পেটে চালান দেয় দ্রোহী।

X বা হাত দিয়ে না বাবা ডান হাত দিয়ে -----

ও ংড়ৎৎু, ংড়ৎৎু মা।

X আচ্ছা আমেরিকায় কি কখনও পরোটা খেয়েছিস? প্রশ্ন করে মেঘলা।

X একবার রুমমেটরা মিলে বানানোর চেষ্টা করেছিলাম। গোল বা চারকোনা কোনটাই করতে পারিনি। পঞ্চভুজ বা ষড়ভুজ টাইপের একটা কিছু হয়েছিল। তা সেই প্রথম দিককার কথা। এখন তো লসএনজেলেস এ তিন চারটা বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্ট হয়েছে। সব কিছু পাওয়া যায়। শুধু একটা জিনিস বাদে।

X কি সেটা?

X খুদের ভাত।

X খুদ তো এখন বাংলাদেশেও পাওয়া যায় না রে বাবা। সালমা বেগম উত্তর দেয়। তোর কি খেতে ইচেছ হচেছ?

X খু-উব - মা। খুদের ভাত রিংয় শুকটি, কালিজিরা ধহফ পাতা ভর্তা। আর ভাতটা রান্না হতে হবে মাটির চুলায়।

দ্রোহীর কথায় সবাই হেসে ফেলে।

X মাটির চুলার ভাত খেতে হলে তো গ্রামের বাড়িতে যেতে হবে।

এক পা দুই পা করে চার পাঁচ বছরের একটা বাচচা ছেলে খাবার ঘরে ঢোকে। চোখে এখনও ঘুমের ভাব, পিট পিট করে ডাইনিং রুম পর্যবেক্ষণ করে একসময় দ্রোহীর দিকে চোখ আটকে যায়। অপরিচিত মুখ, আবার একটু চেনা চেনাও লাগে। অনেকটা বাবার মত দেখতে। ওপরের ঘরে দেয়ালে এরকম দেখতে একটা ছবি আছে। চাচ্চার ছবি।

X বুলেট এই দিকে এসো বাবা। দ্যাখোতো এটা কে?

X ওর নাম বুলেট বলছ কেন? ওর নাম তো তমাল।

X বুলেট কেন তা শিগগিরই টের পাবি। মায়ের আঁচল পেঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে এতক্ষণে বুলেট।

X এই বল না, বল এটা কে? তুই চিনিস না? বুলেটের থুতনি ধরে প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলে মেঘলা। এই বল না কে? বুদ্ধিজীবীর মত কিছুক্ষণ ভাবে বুলেট। একবার বাবার দিকে, একবার দাদীর দিকে এবং শেষে দ্রোহীর দিকে পিট পিট করে তাকায় বুলেট। তারপর মায়ের কানের কাছে ফিস ফিস করে বলে চাচচা। বলেই সাঁ বেগে একটা দৌড় দেয় বুলেট। চার পাঁচ বছরের একটা ছেলে এত জোরে দৌড়াতে পারে তা ধারণায় ছিল না দ্রোহীর।

X ওর নাম বুলেট না হয়ে রকেট হলে ভাল হত। হাসতে হাসতে বলে দ্রোহী।

ভাইয়া বুবুর ঠিকানাটা দাও তো য়ঁরপশ একটা ঢু মেরে আসি।

তুই একা যেতে পারবি না। আমি সাথে যাচ্ছি।

X ঘড় --- ড়ঢ়ং আমি একা যাবো।

X ঢাকা শহরের বর্তমান অবস্থা তুই জানিস না ভাই। এই হেমেন্দ্র দাস রোড থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত যেতে তোর বারোটা বেজে যাবে।

X হি হি হি। তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমি এই মাত্র লঞ্চ থেকে সদরঘাটে নামলাম।

X অনেকটা তাই। আমি বুঝি না তুই এয়ারপোনের বৈতরণি কি ভাবে পার হয়ে এলি।

তাহলেই বোঝ। এবারে চটপট ঠিকানাটা বলত।

X রামপুরা জাহাজ বিল্ডিং এর পাশের গলিতে। ২৩/১, দোতলা। যাচ্ছিস যা। কিন্তু মানিব্যাগ থেকে জরুরি কাগজ পত্র, ও. উ. এগুলো নিরাপদে রেখে যা।

উপদেশটা মনঃপূত হয় দ্রোহীর। সালমা বেগমের হাতে পুরো ওয়ালেট দিয়ে বলে মা আয়াতুল কুরসী পড়ে একটা ফুঁ দেন । আর কিছু বাংলাদেশী টাকা মা ঢ়ষবধংব. মুখ টিপে হাসছে মেঘলা আর ধ্রুব। তার কথায় কি অসংলগ্ন কিছু আছে? ভাবতে থাকে দ্রোহী। তবে বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না। সালমা বেগম পাঁচটা একশত টাকার নোট ছেলের হাতে ধরিয়ে দেয়।

॥ তিন ॥

রাতের বেলা আসার সময় রাস্তাঘাট গুলো ক্যামন যেন চাপা চাপা লাগছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে দুটো রিক্সা দিব্যি একে অপরের বিপরীতে ছুটে চলেছে টুং টুং ঘন্টা বাজিয়ে। হেমেন্দ্র দাস রোড আরেকটু পশ্চিম দিকে গেয়ে নাম নিয়েছে প্যারিদাস রোড। তার আগেই আরেকটা রাস্তা ডান দিকে চলে গ্যাছে। সোজা লক্ষীবাজারের দিকে। রাস্তাটার নাম পাতলা খান লেইন। ঠি - ই - ক মনে আছে দ্রোহীর। হাসি পায় দ্রোহীর। ক্যামন চবপঁষরধৎ নাম।

পাতলা খান লেইনে ঢুকতেই বিরাট জ্যাম। কোন এক প্রেসের সামনে কাগজের ট্রাক থেকে কাগজ ঁহষড়ধফ করা হচ্ছে।

X বান্দির পুতেরা সক্কালকর সকাল বেলায় টেরাক হান্দাইছে গল্লিতে।

কোন এক রিক্সাওয়ালা অদেখা ট্রাক ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলে। ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রমাগত রিক্সার ঘন্টা। ভাগ্যিস রিক্সায় চড়েনি দ্রোহী।

রিক্সা, ট্রাক, পাশে ড্রেন, ছুটে চলা মানুষ, গায়ে গায়ে ধাক্কা। একটু বোধকরি অসুবিধা হচেছ। গায়ে মাখে না দ্রোহী। হাটতে থাকে। লক্ষীবাজার রোডে এসে দ্বিধাগ্রস্ত হয় সে। পুরোনো কনফেকশনারীটা ঠি-ই-ক আছে। আরেকটু পুরোনো হয়েছে। এই যা। কিন্তু আশেপাশে আরো কয়েকটা ফ্যাস্টফুডের দোকান হয়েছে। একটা ঢ়ুরধ ঢ়ষধপব এর সাইন বোর্ড চোখে পড়ে মিউনিসিপ্যালিটির গা ঘেঁষে।

ও - ও - ও মিউনিসিপ্যালিটি কোথায়? এখানে দেখা যাচ্ছে একটা মেয়েদের কলেজের সাইনবোর্ড । উল্টোদিকে সেন্ট গ্রেগরী আর সেন্ট ফ্রান্সিসকো আগের মতই আছে। ডানে বায়ে তাকাতে তাকাতে হাটতে থাকে দ্রোহী। একটু একটু ঘামছে সে। ভাগ্যিস ভারী কোন জ্যাকেট গায়ে দিয়ে আসেনি। হাটতে হাটতে ভিক্টোরিয়া পার্ক বায়ে রেখে জনসন রোড ধরে ন্যাশনাল হাসপাতাল, আজাদ সিনেমা হল, রায়সাহেব বাজার ছাড়িয়ে ইংলিশ রোডের মুখে এসে দাঁড়ায় দ্রোহী।এই ইংলিশ রোড নামটার সাথে ক্যামন যেন নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ ফ্লেভার মাখা আছে। রায়সাহেব বাজারের মোড় থেকে উত্তরে নবাবপুর রোড, পূর্বে ধোলাইখাল, পশ্চিমে ইংলিশ রোড আর দক্ষিণে জনসন রোড। এই ইংলিশ রোড ধরে একটু এগিয়ে ডান দিকে তাকালে অথবা নবাবপুর রোড ধরে মোড়ের মসজিদ পেরিয়ে বা দিকে ঘুরলেই নিষিদ্ধ পল্লীর চুনকাম আর ঠোটে রঙ ঘষা নিষিদ্ধ মানবীদের দেখা যেত। এই পল্লীর এবং পল্লীর বাসিন্দাদের ঘিরে অনেক আদিসাত্বক চটুল ইয়ার্কি ফাজলামি কলেজ জীবনে করেছে দ্রোহী এবং তার বন্ধুরা। এসব ব্যাপারে সবচেয়ে মুখপাতলা আর স্বঘোষিত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিল বল্টু। বল্টু এখন কোথায় আছে কে জানে। হাবিবের কাছে খোঁজ থাকতে পারে। এই নিষিদ্ধ পল্লীর মুকুটহীন সম্রাট ছিল কোন এক হাজী সাহেব। হাজী সলিমুদ্দি বা কলিমুদ্দিন টাইপের একটা নাম। এই মুহূর্তে মনে আসছে না দ্রোহীর। হাজী সাহেব নির্ঘাৎ এতদিনে মন্ত্রী না হলেও মেয়র বা মেয়রের ঘনিষ্ঠ চামচা অথবা নিদেন পক্ষে মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান যে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পল্লীটি উঠে গ্যাছে এখন।

অতীতের সেই নিষিদ্ধ পল্লী বায়ে ফেলে নবাবপুর রোড ধরে আবার হাঁটতে থাকে দ্রোহী। গুলিস্তান মোড়ে এসে একটুও অবাক হয় না সে । লোকে লোকারণ্য গুলিস্তান সেই আগের মতই আছে। শুধু নতুন সংযোজন পাতাল রাস্তা। লোকজন অবশ্যই পাতালের চাইতে জমিনের ওপর দিয়েই বেশী পারাপার হচ্ছে। পাতাল রাস্তা ভ্রমনের খায়েশ এই মুহূর্তে স্থগিত রেখে একটা রিক্সা নেয় দ্রোহী।

থেকে থেকে জ্যামে পড়ছে রিক্সা। খুব একটা গাঁ করে না সে। কোন তাড়া নেই। কাজে তো আর যেতে হচ্ছে না। রিক্সায় অলস ভঙ্গিতে বসে দু'পাশে তাকাতে থাকে। দোকান পাট, ছুটে চলা লোকজন, কালো ধোঁয়া, টেম্পুর ভ্যাট ভ্যাট, বাস কন্ডাকটরের হাকহাকি, উপচে পড়া ডাষ্টবিন, ট্রাফিক কন্ট্রোলরত পুলিশ। অদূরে শিকারীর অপেক্ষায় দন্ডায়মান ট্রাফিক সার্জেন্ট, বাঁদর ঝোলা যাত্রী নিয়ে ছুটে চলা বাস, সব, সবই তো প্রায় আগের মতই আছে। ব্যতিক্রমের মধ্যে, যত্রতত্র ফ্যাস্ট ফুড বা স্ন্যাকসবার, রাস্তায় পর্যাপ্ত সংখ্যক নতুন মডেলের গাড়ি আর পথচারীদের মুখে নেকাব। সব পথচারীর মুখে নয় কেবল মাত্র স্বাস্থ্য সচেতন পথচারী, যারা কালোধোঁয়ার হাত থেকে আংশিক পরিত্রাণ পেতে চায়।

কানের ঠিক তিন গজ দূরত্বে একটা কাঠবডি কান ফাটানো তো বটেই, সেই সাথে গগন বিদারী প্যাপু হর্ণ বাজিয়ে ডি আই টি রোডের দিকে চলে যায়। ওহ খোদা এরকম শব্দে হর্ণ বাজালে তো সবার জন্য বধিরতা প্রকল্প ২০১০ নিশ্চিন্তে বাস্তবায়িত হবে। সবাই বধির হলে অবশ্য এক দিক দিয়ে ভালই হয়। হাসিনা খালেদার মিটিং-এ লোক জড় হবে না।

X কুন দিগে যামু বাইজান এই সামনের বিল্ডিং-ই জাহাজ বিল্ডিং।

X এখানেই রাখেন। পকেট থেকে একশ টাকার একটা নোট বের করে রিক্সাওয়ালার দিকে বাড়ায় দ্রোহী।

X ভাংতি নাই ছোড নোট দ্যান। বেশ বিরক্তি ভরে উত্তর দেয় রিক্সাওয়ালা আর সেই সাথে ডান কাঁধ থেকে গামছা নিয়ে ঘর্মাক্ত মুখ মুছে বা কাঁধে চালান দেয়।

X পুরাটাই রেখে দ্যান। রিক্সাওয়ালার কাঁধে একটা ঃধশব রঃ বধং চাপড় দিয়ে গলির মোড়ে মুদির দোকানের দিকে পা বাড়ায় দ্রোহী। একবার ঘুরে রিক্সাওয়ালার অভিব্যক্তি দেখতে মন চাইছে। লোকটাকি আনন্দে কাঁদছে? না মনে হয়। এরকম বুই কাতলা গোছের ঃরঢ়ং সেও দু'একবার পেয়েছে কিন্তু তার তো কান্না পায়নি।

দশ বছর পর বুবুর সঙ্গে দেখা হচ্ছে। হাতে করে কি কিছু নিয়ে যাওয়া উচিত? এক বাক্স পোলার বা ঈগলু। এই কাজটা দ্রোহীকে দিয়ে কোনদিন সম্ভব হবে না। কারও বাসায় যাওয়ার সময় হাতে করে কিছু নিয়ে যাওয়া। লাজে মরি। মুদির দোকানে বাকী চাইলে যেমন দোকানদার লজ্জা পায়। আর তাছাড়া সে তো যাচ্ছে তার বুবুর কাছে। পৃথিবীতে যাকে সে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। শৈশবের কত ভাল লাগা স্মৃতিই যে আছে লিপির সঙ্গে তার।

২৩/১ বাসাটার সামনে কোন নাম্বার প্লেট নেই। তবে নীচতলায় কুমিল্লা জেনারেল স্টোর নামের একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে। স্টোর একটা দেখা যায় কিন্তু কোন সাইন বোর্ড নেই। স্টোরের ভেতর ঢুকে কালো চ্যাংড়া মতন সেলসম্যানকে জিজ্ঞেস করে দ্রোহী, ভাই ---

X ফোন নষ্ট। ফোন করা যাইব না।

X আমাকে বলছেন?

X জ্বে, আফনে ছাড়া দোকানে আর আছে কেডা।

X আমি ফোন করতে চাইছিনা। কুমিল্লা জেনারেল ----

X এইডাই কুমিল্লা জেনারেল স্টোর। ঝড়ে সাইন বোর্ড পল্টি খাইছে। কারে চান?

এই ফাজিল ছোকড়াটার সঙ্গে কথা বলতে মন চাইছে না দ্রোহীর। উত্তর না দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে ডান পাশের সরু গলিতে ঢোকে সে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে কলিং বেল টিপতেই দরজা খোলে দশ বারো বছরের এক কিশোরী।

X এটাকি পুতুলদের বাসা?

X জ্বে আফনে ক্যাডা।

কেরে শেফালী? পর্দা সরিয়ে ড্রইং রুমে উকি দেয় লিপি। হাতে কুলা ভর্তি চাল। দরজায় দাঁড়ানো আগন্ কের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে লিপি। এক সেকেন্ড, দুই সেকেন্ড, তিন সেকেন্ড ------- আচমকা হাত থেকে চাল ভর্তি কুলা পড়ে যায়।

X আ-আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি। ভাই ভাই আমার। দৌঁড়ে এসে জড়িয়ে ধরে অতি আঁদরের ছোট ভাইকে। দুই হাতে দ্রোহীর মুখমন্ডল, চোখ, নাক, গাল, মাথার চুল পরখ করে নিশ্চিত হয় লিপি।

আমার সোনা ভাই লক্ষী ভাই ----- ক--ত দিন পর --- কথা সম্পূর্ণ করে না লিপি। ভাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে।

বুকের ভেতরটা ক্যামন যেন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে দ্রোহীর। একরাশ শূণ্যতা আবার পরমুহূর্ত ভেতরটা ভরাট। আহ্ শান্তি, কি শান্তি। টের পায় দ্রোহী সে কাঁদছে। নিঃশব্দে নয় শব্দ করে।

ভেতরের ঘর থেকে কান্নার শব্দ শুনে কৌতূহলি পুতুল ড্রইংরুমের পর্দা ফাঁক করে উঁকি দেয়। কয়েক সেকেন্ড নেয় পরিস্থিতি বুঝতে। তারপরই আনন্দে তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে পুতুল।

ও মা ছোত মামা। ভাই বোনের আনন্দ উৎসবে ষোড়সী পুতুল অংশ নেয়। এক সাথে জড়িয়ে ধরে মা আর মামাকে।

সবুজ ডলার দিয়ে কত কিনা পাওয়া যায়। সমুদ্র সৈকতে নগ্ন রমনীর বক্ষ দর্শন করা যায়, চালানো যায় মার্সিডিস অথবা রোলস রয়েস, সুইস ব্যাংকে একাউন্টও খোলা যায়। কিন্তু ডলার দিয়ে কি এমন একটা দেশ পাওয়া যায়? যেখানে আছে ক্ষুধা, দারিদ্রতা, আছে সন্ত্রাস, আছে বন্যা, ক্ষরা, আছে দূর্নীতি। রাজনীতি যেখানে লাম্পট্যে ভরা। আমার সেই দেশে একটা পরিবার আছে। সেই পরিবারে আছে মা, বাবা, ভাই-বোন, ছোট ছোট শিশু আছে অভাবে, কষ্ট, ঝগড়া বিবাদ, আছে বিচ্ছেদ বিরহ আর মিলনের আনন্দ ভরা জলোচ্ছ্বাস।

॥ চার ॥

এঃধশব রঃ বধ্ং!! খুব বড় করে বেড রুমের দেয়ালে সাইনটা টানানো। দ্রোহীর বেডে উপুড় হয়ে শোয়া সামসুদ্দীন। অবশ্য সামসুদ্দীনকে এই নামে কেউ চেনে না। সেই কবে আমেরিকায়, হয়ত নতুন নতুন, নিজের পিতৃ প্রদত্ত নামটা বলতে লজ্জা লজ্জা করত সামসুদ্দীনের। সামসুদ্দীন চৌধুরী। খধংঃ ঘধসব-এর ইংরেজী বানান ঝঃধঃঁব ড়ভ খরনবৎঃু'র মত লম্বা। সংক্ষেপ করলে দাঁড়ায় চোদু। শ্রুতিমধুর নয় মোটেই। ঋরৎংঃ ঘধসব টাও ক্ষ্যাত ক্ষ্যাত। অবশেষে সামসুদ্দীন সংক্ষেপে হলো ঝধস. কালের আবর্তে ঝধস নামটাই এখন সর্বজনবিদিত।

X কিরে অসময়ে শুয়ে আছিস ক্যান স্যাম?

X মন ভালো নেই। মন ভালো নেই। মিতা মেয়েটা শেষ পর্যন্ত ছ্যাক দিল।

X এটা দিয়ে কয় নাম্বার? এপর্যন্ত তিন বার দেশে গেলি। তিন বারই তিন মেয়ের সাথে লটর পটর। ক্যানো বাবা পছন্দ হয়েছে বিয়ে করে আসলেই পারতিস।

X ও বাবা, প্রেমিকা গোল্লাছুট তাইতেই হাস ফাস আর বউ ছুটে গেলে অবস্থাটা কি হতো বলতে পারিস? যা-ক এখন আর চিন্তা নেই। দেখছিস না দেয়ালে বড় করে সাইন টানানো ঃধশব রং বধ্ং. সকাল বিকাল দুপুর একবার করে দেয়ালে তাকাবো আর বলব ঃধশব রং বধ্ং. সকল মুশকিল আসান হে হে হে।

X দরজায় কে যেন নক করছে। দাঁড়া এক সেকেন্ড দেখে আসি। দরজা খুলতেই সামনে চারজন লোক দেখতে পায় দ্রোহী। এদের সবাইকে চেনে সে।

X আরে বিলা ভাই কি খবর? আপনি হঠাৎ?

X তোমাদের খোঁজ খবর নিতে এলাম। ঘরের ভেতরে এসে সোফার মধ্যে বসতে বসতে উত্তর দেয় বিলা। বিলার পেছনে পেছনে তার সাগরেদরাও ঢোকে।

X হে হে হে যাক ভালই হয়েছে তোমরা দু'জনেই আছ। জানোইতো সামনে বষবপঃরড়হ. হে হে আবার মনে করো না বষবপঃরড়হ সামনে বলেই দেখা করতে এসেছি। দীর্ঘ দিন দেখা হয় না -----

বেলাল ওরফে বিলা এক নাগাড়ে কথাই বলে যাচ্ছে। হারামজাদাকে থামানো দরকার।

X উষবপঃরড়হ? কিসের বষবপঃরড়হ? সে তো হওয়ার কথা দুই হাজার সনের শেষের দিকে। ডেমোক্রেটিক বনাম রিপাবলিকান। আর তাছাড়া আমরা তো অসবৎরপধহ পরঃরুবহ না। দ্রোহীর কথার সাথে মাথা ওপর নীচ করে সায় দেয় ংধস.

X ইসস্। জিবে কামড় দেয় বিলা। সেই বষবপঃরড়হ না। এটা হচ্ছে বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব লসএঞ্জেলেস, সংক্ষেপে যাকে তোমরা বল ইঅখঅ, তার বষবপঃরড়হ.

X হো হো হো। ইচ্ছা করেই হাসিটাকে দীর্ঘায়িত করে দ্রোহী। বিলা আর তার সহোযোগীরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছে ওরা।

X হাসছ যে?

X হাসছি এই জন্য যে আপনি বষবপঃরড়হ-এ দাঁড়িয়েছেন আবার ভোটও চাইতে এসেছেন। তু তু তু। কুকুর ডাকার মত জিহ্বা দিয়ে শব্দ করে দ্রোহী।

এবারে আর মুখ চাওয়া চাওয়ি না, এক দৃষ্টিতে, একেবারে অগ্নি শর্মা হয়ে তাকিয়ে আছে বিলা।

X শোনেন বিলা ভাই। আপনাকে আমি ভোট দেব, প্রয়োজনে আপনার হয়ে আমি নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিব। কিন্তু তার আগে আমাকে কিছু তথ্য আপনি দেবেন। এটাকে পরিসংখ্যানও বলা যায়। এক নম্বর হচ্ছে, এপর্যন্ত কতজন বাঙালীর কাছ থেকে গ্রীন কার্ড করে দেবেন বলে টাকা নিয়েছেন এবং ফেরৎ দেননি। নম্বার টু, এ পর্যন্ কতজন নতুন আসা

বাঙালীর কাছ থেকে ছলে বলে পাসপোর্ট হাতিয়ে সেগুলো দিয়ে আদম ব্যবসা করেছেন? এ পর্যন্ত --- একি উঠছেন কেন? বিলা বাহিনী আর অপেক্ষা করে না। মানে মানে কেটে পড়ে। তবে যাওয়ার আগে বিলা দ্রোহীর দিকে একটা বিশেষ চাহনি দিয়ে যায়। যার সহজ অর্থ হচ্ছে শালা তোর একদিন কি আমার যে ক'দিন লাগে।

বিলা গ্রুপ চলে যাওয়ার পর স্যাম বলে কাজটা ভাল করলি না দোস্ত। লোকটা দু'দুবার এম পি হয়েছিল। শুধু একটা খুনের মামলায় ----

X আরে রাখ তোর এম পি। এটা হচ্ছে হু কেয়ারস এর দেশ। ডযড় পধৎবং? আমি এখন দেশে একটা ফোন করব। মেলা দিন হয় কথা বলি না।

প্রায় তেলেসমাতি দেখিয়ে একবারেই বাংলাদেশে রিং হচ্ছে। এক দুই তিন বার -

X হ্যালো। মিষ্টি একটা কণ্ঠ। রিনিঝিনি বেজে ওঠে দ্রোহীর কানে। এত মিষ্টি কণ্ঠ ইহ জনমে শোনেনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত দ্রোহী। পর জনমেও শোনার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

X হ্যালো কে বলছেন?

X আ আ মি দ্রোহী, কে?

X আপনি কত নম্বর চাচ্ছেন?

X টু থ্রি ও ফাইভ নাইন ও।

X না আপনি রং নাম্বারে ডায়াল করেছেন।

হ্যালো হ্যালো -- টুকুস করে লাইন কেটে গেল। ফোন লাইন কাটার শব্দ যে এত কটু আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয় তা আগে জানা ছিল না দ্রোহীর।

পাশেই বসা ছিল স্যাম।

কিরে দোস্ত চেহারা রাম ছাগলের মত করে আছিস ক্যানো। গালি টালি দিয়েছে নাকি।

X গালি দিলে তো ডিগবাজী দিতাম এতক্ষণ। এই শীতের রাতেও প্যাসিফিকে দাপাদাপি করতাম ঘন্টা খানেক।

X রবীন্দ্রনাথ কি বলেছে জানিস দোস্ত?

X কি?

X যেখানে দেখিবে বাতাস উড়াইয়া দেখ ছাই। বাতাস যখন পাওয়া গ্যাছে তখন ছাই উড়াতে দোষ কোথায়? আবার ফোন কর ভাগ্য ভাল থাকলে একই জায়গায় যাবে।

আবারও বাসার নাম্বরে ডায়াল করে দ্রোহী।

X হ্যালো, এটাকি টু থ্রি ও ফাইভ নাইন ও?

X না এটা হচ্ছে টু ফাইভ থ্রি জিরো থ্রি ওয়ান।

X ও আচ্ছা সরি। আপনার নামটা কি জানতে পারি?

কথা শেষ করার আগেই লাইন কেটে যায়। ভুলে যাওয়ার আগে নাম্বারটা নোট বুকে টুকে রাখে দ্রোহী। এবারে বিজয়ীর বেশে তাকায় স্যামের দিকে।

X ইউ গট ইট ফু হ্।

X ইয়াপস, ইয়াপস।

X শোন, এবারে এই অভিজ্ঞ প্রেমিকের কাছ থেকে কিছু ট্রিক্স জেনে নে।

খুব একটা গরজ করতে চায় না দ্রোহী। কিন্তু আরেক বার সাধিলে খাইব স্টাইলে তাকিয়ে থাকে স্যামের দিকে।

X শোন, এরপর ফোন করে প্রথমেই মেয়েটাকে যে কোন নামে সম্বোধন করবি। এই ধর মৌসুমী, বাতাসি, হৈমন্তি, বিলাশী যে কোন কিছু। বলবি ক্যামন আছো বাতাসি? এক বার, দুবার, ম্যাক্সিমাম তিন বারের মাথায় মেয়েটা তার আসল নাম বলে ফেলবে। আমার ফর্মূলা কাজে না লাগলে পয়সা ফেরত। তবে হ্যা, ভুলে তুই যদি কাজের বুয়া বা ওর মা অর্থাৎ খালাম্মাকে একই সংলাপ বলিস তাহলে কিন্তু জাতির ইতিহাসে এক কলংকজনক অধ্যায়ের সূচনা হবে।

X ওকে, তোর ফর্মূলার সত্যতা যাচাই হয়ে যাক?

এবারে বাসার নাম্বারে ডায়াল না করে মেয়েটার দেওয়া নাম্বারে ডায়াল করে দ্রোহী।

X হ্যালো সুলতানা ক্যামন আছো?

X ঝড়ৎৎু আমি সুলতানা না। এক সেকেন্ড ধরেন আমি সুলতানাকে দিচ্ছি। অপর প্রান্তেও সেই সুরেলা কণ্ঠ।

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে যায় দ্রোহী। এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না। হা করে তাকিয়ে থাকা স্যামকে উদ্দেশ্য করে বলে

X দোস্ত সুলতানা নামের কেউ একজন সত্যি এ বাসায় আছে।

X চেপে যা, চেপে যা। দ্যাখ পরিস্থিতি কোন দিকে যায়। আর হ্যান্ড সেটটা রেখে স্পীকার অন করে দে।

X হ্যালো, সুলতানা ব্যাগম বলতাছি। আফনে ক্যাডা? কুনো কতা কয়না ক্যান ছুডো আফা।

মাছের মত হা হয়ে গেছে দ্রোহীর মুখ। চোখ দুটো বড় বড়। এ যাত্রা রক্ষা করে স্যাম।

X হ্যালো সুলতানা ব্যাগম শোন। আমি তোমার ছুডো আফার সঙ্গে কথা বলব। কি যে নাম তোমার আফার?

X আমার নাম? আমার নাম সুলতানা ব্যাগম। হ্যালো হ্যালো সুলতানার গলা বেশ চড়ে গ্যাছে।

X হ্যালো, সুলতানা তোমার নাম না তোমার আফা, ছুডো আফার নাম জানি কি?

X ও---- ছুডো আফার নাম? ছুডো আফার নাম বর্ষা ব্যাগম।

X আচ্ছা তাহলে বর্ষা ব্যাগমকে একটু দাও কথা বলি।

X খাড়ান দিতাছি।

অপর প্রান্তে ছুডো আফার গলা শোনা যায় না পরিবর্তে রিসিভার রেখে দেওয়ার খটাস আওয়াজ হয়।

ফোন রেখে দ্রোহীর ওপর চড়াও হয় স্যাম।

X শালা পাঠা, খাটাশ। তোর পূর্ব পুরুষ কি উজবেকস্তানের লোক ছিল নাকি?

X ক্যানো আমি কি করলাম? তুই যা বলেছিস তাইতো করলাম।

X আরে পাঠা! সুলতানা, রাজিয়া, মরিয়ম এসব কোন নাম হলো? একটু আধুনিক নাম বলবি না? যাক ধঃ ষধংঃ সুন্দরীর নামটাতো জানা গ্যাছে। আজকে আর না। রবীন্দ্রনাথ এরকম পরিস্থিতিতে কি বলেছেন জানিস?

X রাখ তোর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ এরকম পরিস্থিতিতে পড়েছে নাকি যে বলবে।

X হো হো হো। যা বলেছিস। এই সুবাদে একটা মুভি হয়ে যাক। কি বলিস? ঞড়স ঐধহশং-এর নতুন ছবি এসেছে ঝধারহম চৎরাধঃব জুধহ.

X ঙশধু, ষবঃ্থং মড়.

॥ পাঁচ ॥

সেদিনের পর থেকে অনেকটা নেশার মত হয়ে গ্যাছে দ্রোহীর। প্রতি রাতে কাজে থেকে এসে একবার করে বর্ষার নাম্বারে ফোন করে দ্রোহী। কিন্তু প্রতিবারই খালাম্মা শ্রেণীর এক মহিলার ভারী কণ্ঠ শোনা যায়। আল্লাহ জানে এটা কি খালাম্মা নাকি ছুডো আফার বড় বা মেঝো আফা। স্যামের সঙ্গে সারা সপ্তাহ দেখা হয় না দ্রোহীর। এক মাত্র বৃহস্পতিবার দ'ুজনের একই সময়ে কাজ থেকে ছুটি হয়। এবং কাজ পরবর্তী সময়টা দ'ুজনে একসঙ্গে কাটায়। আজকে আবার সেই বৃহস্পতিবার। দু'বন্ধু বৈঠকে বসেছে। বেডরুমে ঞধশব রঃ বধংু ংরমহ আর নেই। স্যাম ইতিমধ্যেই আরেকটা মেয়ের প্রেমে পড়েছে। এবারে প্রবাসী বাঙালী ললনা। ম্যায় কেয়া হনুরে স্টাইলের। এতে অবশ্য স্যামের কোন বিকার নেই।

X দোস্ত বুঝলি না এটাও টুডে অর টুমোরো বাগাট্টা হয়ে যাবে। আর তাছাড়া আমার জন্য দেশী বঙ্গ ললনা আর ব্যাংলো আমেরিকান সমান কথা। আমি ভাবছি তোর ব্যাপারটা। কমসে কম সুলতানা ব্যাগমের সাথে কথা বলতে পারলেও রহস্যের একটা কুল কিনারা হতো। তবে আমরা হাইপোথেসিস করতে পারি। তারপর পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে একটা থিওরি দাঁড় করাতে পারি।

X আমার মনে হয় কি জানিস? মেয়াটা বিবাহিতা এবং দু/তিন সন্তানের জননী। দ্রোহী তার ধারণার কথা জানায় স্যামকে।

X হ্যাঁ এটা হচ্ছে হাইপোথেসিস নাম্বার ওয়ান। মেয়েটা বিবাহিতা এবং ঐ সময় সে বাপের বাড়ি নায়োরে ছিলো। এখন স্বামীর বাড়ি চলে গ্যাছে।

নাম্বার টু মেয়েটার মা বাবা খুউব ফরহেজগার টাইপ, সৈয়দ বা এই জাতীয় বংশের। অবিবাহিত অল্প বয়স্কা জেনানা পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলবে এটা ঠিক শোভন নয়।

এবারে নাম্বার থ্রি এবং সর্বশেষ হাইপোথিসিস হচ্ছে মেয়েটা বিশ্ববিদ্যালয় বা মেয়েদের কোন কলেজে পড়ে এবং থাকে হোস্টেলে। ক্যাবল মাত্র ছুটি বা হরতালের আগের দিন বাসায় আসে। যদি হাইপোথিসিস সত্য হয় তবে চেষ্টা করে লাভ নেই ফলাফল হচ্ছে বোতল ধরা। দ্বিতীয়টা সত্য হলে, তোকে অপেক্ষা করতে হবে সুবর্ণ কোন সুযোগের জন্য। যেমন ধর মেয়েটার দুঃসম্পর্কের কেউ মারা গেল। তখন মহিলা তার মেয়েকে, নিদেন পক্ষে সুলতানা ব্যাগমকে বাসায় রেখে মৃত বাড়িতে যেতে পারে এবং তখন যদি তোর কপালে শিকে ছেড়ে। আর তৃতীয়টা - না না আগে একটা বিড়ি দে সুখ টান দিয়ে নিই।

স্যামকে একটা মার্লবোরো লাইটস দিয়ে নিজেও একটা ধরায় দ্রোহী।

X তুই তো দেখা যাচ্ছে সত্যি সায়েন্টিফিক প্রসিডিওরে আগাচ্ছিস। যাকে বলে নিউটন, আইনষ্টাইন এদের ফ্রেন্ড স্টাফদের মত কথা বলছিস।

X শোন, শোন ঐ সব বৈজ্ঞানিকদের কথা বলিস না। পৃথিবীতে আজকে এত যে অনাচার, খুন খারাবী, শান্তির নামে যুদ্ধ এগুলো তো ঐসব ছতছাড়া বৈজ্ঞানিকদেরই অবদান। মানুষ হিসেবে আমি ওদের চাইতে অনেক উন্নত। আমার ঃযবড়ৎু হচ্ছে, জগতের প্রতিটি নরনারী শুধু প্রেমে মশগুল থাকবে। অবশ্যি এসব আধ্যাত্মিক কথা বোঝার সময় এখনও তোর হয়নি। মোটামুটি লাইনে এসেছিস বলা যায়। নো চিন্তা আমি সময় মত সাইজ করে দেব। হা হা হা।

X তুই কিন্তু এখনও তৃতীয় সম্ভাবনার কথা বলিসনি।

X ও হ্যাঁ যদি মেয়েটা হলে থেকে পড়াশোনা করে এবং ঢাকা অথবা তার আশেপাশে থাকে তবে ধরে নেওয়া যায় প্রতি বৃহস্পতিবার সে বাসায় আসে। শুক্রবার থাকে, শনিবার সকালে আবার পাঠশালায় ফেরত যায়।

X আজকে এখানে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ বাংলাদেশে শুক্রবার দুপুর। তো পরীক্ষা করা যাক।

X তাই হোক। অদ্য শেষ রজনী।

বিসমিল্লাহ্ --- এক দুই করে ছয়টা নাম্বার ঘোরায় দ্রোহী।

X হ্যালো --- ও।

অনেক দূর থেকে চুড়ির রিনিঝিনি আওয়াজের মত ভেসে আসে সেই মিষ্টি কণ্ঠ। শুধু হ্যালো বলার জন্য যদি কোন অস্কারের ব্যবস্থা থাকত, তবে এই মেয়েটা নিশ্চিত নমিনী হতো। তবে বাংলাদেশের মত একটা অখ্যাত দেশের প্রার্থী হওয়ায় পুরস্কারটা হয়ত পেতনা।

X হ্যালো, ক্যামন আছেন বর্ষা?

অন্য প্রান্তে কোন কথা নেই।

X বর্ষা আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?

X হ্যাঁ চিনেছি। দয়া করে বলবেন কি বিদেশ থেকে এত পয়সা খরচ করে খামোখা আমাকে ফোন করেন ক্যান?

X আমি বিদেশ থেকে ফোন করি তা আপনাকে কে বলল?

X প্রশ্নের উত্তর কখনও প্রশ্ন দিয়ে হয় না।

X আচ্ছা ঠিক আছে আমি উত্তর দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলবেন কি, যে আপনি হল থেকে কবে ফিরেছেন?

X হি হি হি।

এত সুন্দর করে মানুষ হাসতে পারে জানা ছিলনা দ্রোহীর।

X আপনি কি জানেন আপনার হাসি আর পরীদের নিককন কেহ নাহি জিনে কারে সমানে সমান?

X নাহ্ জানতাম না এখন জানলাম। অবশ্যি আপনার মত অনেক উম্মাদ একাধিকবার আমাকে অনেকের সঙ্গে তুলনা করেছে। এই ধরেন, মাধুরী দিক্ষীত, জুলিয়া রবার্টস ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে তারা সবাই মর্ত্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আপনার মত একলাফে আসমানে ওঠেনি। দেশী পাগল আর বিদেশী পাগলের মধ্যে আসল পার্থক্যটা এখানেই। কি বলেন?

X হো হো হো যা বলেছেন? আচ্ছা ম্যাডাম আপনার নামের শেষ অক্ষর কি তালব্য শ না মর্ধূণ্য'ষ?

X আপনি খু-উব সুন্দর করে এবং গুছিয়ে কথা বলতে পারেন আবুল কালাম সাহেব। যে কোন মেয়ে ফোনে কথা বললে আপনার প্রেমে পড়ে যাবে। কিন্তু আমি পারলাম না দুঃখিত। তবে আমি বেশ কিউরিয়াস একটা প্রশ্নের উত্তরের জন্য।

X প্রশ্নটা কি?

X আমি যে হলে থাকি, তা আপনি কি করে জানলেন?

X লেটস মেইক এ ডিইল। আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন, আমি আপনারটা, হাউ ইজ দ্যাট?

X ঠিক আছে বলছি। আমার ভাইয়া থাকে নরওয়েতে। প্রতি শুক্রবার সে ফোন করে এবং রিসিভার উঠালে একটা অন্যরকম আওয়াজ হয়। আপনার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কাজেই সহজেই অনুমান করা যায় যে আপনি দেশের বাইরে থেকে ফোন করেছেন। অবশ্যি এতক্ষণ ভেবেছিলাম আপনি নরওয়ে থেকে বলছেন। কোন না কোন ভাবে আমার ভাইর কাছ থেকে ফোন নাম্বার চুরি করেছেন। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত, আপনি কানাডা বা আমেরিকার কোথাও থেকে কথা বলছেন। খুব সম্ভবত নিউইয়র্ক থেকে। কি ঠিক বলেছি না আবেদ আলি সাহেব?

X ম্যাডাম আমার নাম আবুল কালাম বা আবেদ আলি কোনটাই না।

X নাম দিয়ে আমার খুব একটা দরকার নেই। ঝটপট আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন। আমার মা যে কোন সময় এসে পড়তে পারে।

X উত্তর গুলো আগামী শুক্রবার দিব ঠিক আছে? ইুব হড়ী.

ফোন রেখে স্যামকে উদ্দেশ্য করে বলে দ্রোহী কি বুঝলি ডঃ স্যাম?

X দাঁড়া দাঁড়া, তুই আমাকে ডক্টর বলছিস? তুই তো দেখি কবিরাজ শ্রেণী থুড়ি কবিরাজ না পীর শ্রেণীর লোক। দোস্ত একটু সোজা হয়ে দাঁড়া, তোকে একটু কদমবুসি করি।

X থাক থাক বেঁচে থাক। আশির্বাদ করার ভঙ্গিতে হাত ওঠায় দ্রোহী।

X আজকে একটু ব্যতিক্রমী আনন্দ করলে ক্যামন হয়। লোভে চক চক করছে স্যামের চোখ। ক্যাব ড্রাইভাররা সাধারণত পিশাচ শ্রেণীর হয়। যমের দুয়ারে এক পেনি পড়ে থাকলেও সেটা কুড়িয়ে আনতে চায় এখানকার বাঙালী ক্যাবীরা। কিন্তু স্যাম একটু ব্যতিক্রম। পয়সা কড়ির প্রতি কোন লোভ নেই। বিশেষতঃ পার্টি আনন্দ উৎসব অথবা আউটার স্টেইট-এ ভ্রমণের কথা শুনলে কাজ কাম সব চুলায়।

X কি করতে চাস? চল গাড়ি রেন্ট করে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের দিকে যাই। চমৎকার ওয়েদার।

X না না দূরে কোথাও না। কাছে ধারে, এ যেমন ধর ঘবি চড়ৎঃ বীচ। বেশ নিরিবিলি আছে। নাঙ্গা হয়ে আমরা দুজনে সমুদ্র স্নান করব।

X ওয়াও। মারহাবা। চমৎকার আইডিয়া। হুমায়ূন আহমেদ ফেইল। চল চল তাড়াতাড়ি চল। শীঘ্রশঃ শুভমঃ।

॥ ছয় ॥

সস্তার তিন অবস্থা। কথাটা সঠিক না। দ্রোহীর মতে কমসে কম চার অবস্থা। বঙ্গ বাজার হকার্স মার্কেট থেকে খুব সস্তায় একটা ট্রাউজার আর জ্যাকেট কিনেছিল দ্রোহী। উদ্দেশ্য ছিল একটু দৌড় ঝাঁপ করা। তা বঙ্গ বাজারে ঢুকে গরমে আর লোকের ভিড়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার যোগাড়। এতো গেল প্রথম অবস্থা। কোন রকমে দাম দস্তর করে জিনিস কিনে মার্কেটের বাইরে এসে পকেটে হাত দিয়ে দেখে মানিব্যাগ নেই। গেল দ্বিতীয় অবস্থা। প্রথম দিনে বাহাদুর শাহ পার্কে গোটা দশেক চক্কর দিয়ে যেই না একটু উঠ বস করতে গ্যাছে ওমনি ফটাস করে ট্রাউজার গেল ছিড়ে। নীচে হাফ প্যান্ট পরা না থাকলে আজকে ইজ্জত সম্মানের সওয়াল হয়ে দাঁড়াতো। গেল তিন নাম্বার অবস্থা। রিক্সায় অনেকটা চোরের মত যুবু থুবু হয়ে বসে থাকে দ্রোহী। ভোরের ঢাকা শহরকে বেশ পবিত্র মনে হচ্ছে। ছোট ছোট প্রজাপতির মত বাচ্চারা ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যাচ্ছে। কেউ বা মা বাবার হাত ধরে হাঁটি হাঁটি কেউ বা রিক্সায়। চোখে মুখে রাজ্যের বিরক্তি প্রতিটি শিশুর। আহারে অবুঝ শিশুরা তোমরা যদি বুঝতে যে এ সময়টা কত্ত মধুর। এ দৌলত ভি লেলো ইয়ে সাহারাত ভি লেলো, ভালে ছিনলো মুজছে মেরি জওয়ানি। মাগার মুঝকো লটাদো বাচপান কা শাওয়ান ও কাগজ কি কাস্তি ও বারিস কা পানি। হু হু হু।

তিন নাম্বার অবস্থাটা কোন রকমে রক্ষা পেলেও চার নম্বরে এসে মহা বিপদে পড়ে যায় দ্রোহী। ড্রইং রুমে ঢুকেই সিতারা ফুপুকে দেখতে পায় সে। আগে মহিলার ওজন ছিল টন খানেক। এ দশ বছরে ওজন নির্ঘাত হন্দরে গিয়ে পৌঁছেছে। সিতারা ফুপুর উল্টো দিকের সোফায় বুবু আর মা বসা। ফুপুর বা পাশে বসে পুতুল আপন মনে পান বানাচ্ছে। আর ফুপুর ডান পাশে বসা

একটি মেয়ে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া। মেয়েটার মধ্যে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র আছে। অথবা ররীন্দ্রনাথের ভাষায় সুন্দর হে সুন্দর।

X আস্ সালামু আলাইকুম ফুপু ক্যামন আছেন?

X একি রে দ্রোহী। তুই তো সেই আগের মতই আছিস। বরং আগের চেয়ে একটু কালো হয়েছিস। তোকে দেখে মনেই হয় না তুই দশ বছর আমেরিকায় ছিলি। আমার কাইয়ুম যখন প্রথমবার আসল তখন তো চেনাই যায় নাই। গায়ের রং মাশ আল্লার। হা করে তাকিয়ে আছিস কেন পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা কি ভুলে গেছিস?

চার নাম্বার বিপত্তিটা বাঁধে এখানেই। এ অবস্থায় সালাম করা মোটেই সম্ভব নয়। তবে বুদ্ধির জোরে এই যাত্রা বেঁচে যায় দ্রোহী।

X ফুপু আসলে আমি আসার সময় ড্রেনে পড়ে গিয়েছিলাম।

দ্রোহীর কথা শুনে মেয়েটা ফিক করে হেসে ওঠে। মেয়েটার একটা এক্সট্রা দাঁত আছে। হাসলে দাঁত বের হয়ে মুক্তোর মত ঝলক দেয়। রবীন্দ্রনাথ কি এ ধরনের হাসি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেছেন? সব ব্যাপারেই নাক গলানোটা ভদ্রলোকের অভ্যাস ছিল। এটাকে বদাভ্যাসও বলা যায়।

X ফুপু তাহলে আপনি সোজা হয়ে দাঁড়ান আপনাকে সালাম করি।

X ফাজলামো করার আর জায়গা পাস না না। ভাল করে সেম্পু দিয়ে ঘষে গোসল সেরে তারপর সালাম করবি।

সিতারা বেগম দ্রোহীর আপন ফুপু না। বাবার খালাতো বোন। মহিলার আনেকগুলো বাজে অভ্যাসের মধ্যে একটি হচ্ছে গায়ে মানে না আপনি মোড়ল স্বভাব। মহিলার হাজব্যান্ড মোতালেব চৌধুরী দেশে প্রথম দশজন রইচ আদমির মধ্যে একজন। মোতালেব ফুপা কাস্টমস অফিসার ছিলেন। আগে লক্ষ্মীবাজারের পাঁচ ভাই ঘাট লেইনে দুই রুমের একটা বাসায় ভাড়া থাকত। এরশাদের আমলে আচমকা আংগুল ফুলে বটগাছ। তারপর সপরিবারে বনানি যাত্রা।

চিত্রা সিং এর গজল গুন গুন করে গাইতে গাইতে গোসলখানা থেকে টাওয়াল পেচিয়ে বেরিয়ে নিজের ঘরের পর্দা সরায় দ্রোহী। খাটের ওপর সেই মেয়েটা বসা।

X ক্যামন আছো দ্রোহী ভাই?

X ভাল। তুই ক্যামন আছিস খুকী?

X ঐ ঘরে একেবারেই চিনতেই পারলে না এখন দেখি একেবারে ছোট বেলার ডাক নাম সহ মনে আছে।

X সত্যি কথা বলতে কি জানিস খুকী প্রথমে চিনতে পারিনি। তারপর যখন তুই হাসলি তখন ঠিইক চিনতে পেরেছি।

X ক্য হ নো। ছোট করে হাসে খুকী ওরফে নূরুন্নাহার আক্তার। মুক্তোর মত ঝলক দেয় ওর লক্ষ্মী দাঁত। নাহারের স্যাম্পু করা অবাধ্য চুল চোখের সামনে এসে পড়ে। হাত দিয়ে চুল সরিয়ে এক অপূর্ব ভঙ্গিমায় তাকায় নাহার দ্রোহীর দিকে।

X আমাকে খুকী বলে ডাকবে না প্লীজ। আমার, আমার আরেকটা নাম আছে মনে আছে নিশ্চয়ই। দ্রোহী ভাই তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

X খুব গোপনীয়?

X হ্যাঁ অনেকটা।

X বলিস কি? সুন্দরী কোন মেয়ের গোপন কথা মানেই তো প্রেম নিবেদন করা। তা আগে বলবি তো সেভটা করে আসতাম। আর গায়ে একটু পারফিউম ঈধষারহ কষবরহ.

X ফাজলামো না, সিরিয়াস। আমার সামনে একটু বোস প্লীজ।

চল্লিশ বছরের পুরোনো ভারী সেগুন বা গর্জন এই জাতীয় কাঠের তৈরী চেয়ার টেনে নাহারের সামনে বসতে বসতে বলে দ্রোহী।

X আ হা বল। বল বল শিগ্গির বল। কিন্তু বলার আগে ছোট্ট করে একটু মুচকরাদো X

X বাহ তুমি যে কিনা। দশ বছরে এক ফোটা পরিবর্তন নেই। লক্ষ্মী দাঁত বের করে হাসতে হাসতে আবার চুল সরায় নাহার।

X শোন দ্রোহীভাই, মা চাচ্ছে তোমার সাথে আমার বিয়ে দিতে।

X আমি এক পায়ে রাজী।

X আগে পুরোটা শুনেই নাও। আমি অন্য একটা ছেলেকে ভালবাসি। অং ধ সধঃঃবৎ ড়ভ ভধপঃ ছেলেটাকে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই বিয়ে করতে যাচ্ছি। তুমি চাইলে সাক্ষী থাকতে পার।

X ছেলেটা করে কি?

X মুশকিল তো এখানেই। কিছু করে না। ভ্যাগাবন্ডের মত ঘোরে, আর কবিতা টবিতা লেখে। বাংলায় এম, এ।

অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দ্রোহী নাহারের দিকে। বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে সেই বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না অবস্থাটা আর নেই। যা বলার অতি স্পষ্ট।

X তুই তো আমাকে একেবারে পথে বসালি। জীবনের প্রথম প্রেম এবং তার পর মুহূর্তেই ছ্যাক।

X ইস্, ঢং করোনা। আমেরিকান ছেলেদের সম্পর্কে খুব একটা ভাল ধারণা কিন্তু বাংলাদেশের মেয়েদের নেই। যেখানেই কোপ মারো একটু বুঝে শুনে বুঝলেন পচা ভাই।

পচা দ্রোহীর ছোট বেলার নাম। শৈশবে অনেক খুজলি পাচরা হতো দ্রোহীর। তাই অনেকে পচা বলে ডাকত। বড় হওয়ার পরও সেই নাম বহাল ছিল।

X হি হি হি ক্যামন লাগল পচা ভাই ডাক শুনতে?

X ভাল লাগল। আমার নাম টা মনে রেখেছিস সেজন্য ভাল লাগল। আর তোর বিয়ে কোন কাজী অফিসে?

X মোহাম্মদপুর কাজী অফিসে। মোহাম্মদপুরের কাজী সাহেব আবার সিদ্দিকের আপন খালার ননদের ভাসুরের মেয়ের জামাই। সে হিসাবে কাজী সাহেব সিদ্দিকের ভাই লাগে। বিয়ের দিন ঠিক হলে তোমাকে জানাবো। সিতারা ফুপুর সঙ্গে শুধু এই একটা জায়গায় নাহারের মিল। আর তা হচ্ছে এক নাগাড়ে কথা বলা। সিদ্দিক সম্পর্কে আরও কিছুক্ষণ বক্তব্য রাখে নাহার। কিন্তু দ্রোহীর কান উৎকর্ণ হয়ে আছে কলিং বেলের আওয়াজ শোনার জন্য। যে কোন সময় হাবিব আসবে। তারপর দু'জনে একসঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর যাবে।

দরজায় উঁকি মরে পুতুল।

X ছোত মামা, রাঙা নানু তোমাদেরকে ডাকে। ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে নিয়েছে দ্রোহী।

পুতুলকে সাথে নিয়ে নাহার ছাদের দিকে চলে যায়। এক পা দু'পা করে ড্রইং রুমের দিকে পা বাড়ায় দ্রোহী।

সোফার মধ্যে পূর্ববত পানের ডিব্বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে সিতারা ফুপু বসে আছে।

X তা ফুপু, ফুপা ক্যামন আছেন?

X ওর কথা আর বলিস না বাবা। সেই সকালে বের হয় অফিসে, ফেরে রাত দশটায়। অফিসের কাজ যেন তার সব একলারই। সিতারা ফুপু এবারে তার স্বামীর সততার বয়ান শুরু করে দেয়। দ্রোহীর মনযোগ অবশ্যি এদিকে নেই। ড্রইং রুমের খোলা দরজা দিয়ে খোলা উঠোনে এবং তারপর পাঁচ ফুট উচু দেয়াল পেরিয়ে দ্রোহীর দৃষ্টি চলে যায় রাস্তার ওপারে দোতলা বাড়িটির ছাদে। নাইন টেনে পড়ুয়া একটা মেয়ে চাঁদে দাঁড়িয়ে কারো সঙ্গে ইশারা ইঙ্গিত বিনিময় করছে। প্রতিপক্ষ অর্থাৎ যে ছেলেটার সঙ্গে মেয়েটা ফিল্ডিং মারছে তাকে দেখতে পায় না দ্রোহী। খুব চমৎকার একটা দৃশ্য। ঘরের কোনে, দেয়ালে, অথবা পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা রোদ্দরের মত অসংখ্য ছিদ্র পথে স্কুল আর কলেজ জীবনের স্মৃতি গুলো উঁকি ঝুকি মারছে দ্রোহীর অবচেতন মনের আনাচে কানাচে। দরজায় কলিং বেলের শব্দে অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে আসে দ্রোহী।

ফুপু এক সেকেন্ড আমি আসছি। দরজা খুলতেই দুজন লোক দেখতে পায় দ্রোহী। পেছনের জন হাবিব কালো রঙের গেঞ্জি আর জীনস প্যান্ট পড়া। আর সামনের জন নোংরা বেল বটম সুতির প্যান্ট পরা। তেলচিটে পড়া একটা শার্ট রংটা বোধ হয় একসময় সাদা ছিল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। মাথায় বড় সড় একটা টাক। শীর্ণ দেহের লোকটিকে দেখলে মনে হবে সোমালিয়া বা ইথিওপিয়া থেকে এসেছে। কিন্তু সোমালিয়ান বা ইথিওপিয়ানের হাতে কাপড় দিয়ে ঢাকা আর পাটের রশি দিয়ে গলায় বাঁধা এ্যালুমিনামের পাতিল থাকার কথা না। লোকটির ডান হাতে পাতিলের রশি আর এক জোড়া নারিকেল। বা হাতে রং করা মুড়ির টিন আর চটের একটা ব্যাগ।

X বাজান তুই ক্যামন আছস রে বাজান?

বাজান। সিনে পর্দার মত, বর্তমান বাজান শব্দের সাথে অতীতের কোন বাজান শব্দের মিল খোঁজার জন্য থ্রিডি মোশনে দ্রোহীর স্মৃতি মহাশূণ্যের দিকে যাত্রা করে। খুব বেশী দূর যেতে হয় না। ফেরদৌস নামের এক বিশাল গ্রহে ধাক্কা খায় দ্রোহীর স্মৃতি যাত্রা।

X ফেরদৌস চাচা। হাতের মাল সামান মাটিতে রেখে জড়িয়ে ধরে দ্রোহীকে ফেরদৌস।

X বাজান আমার বড় অইছে আর বড়লোকও অইছে। তাই চিনতে পারতেছিলি না, না?

X না চাচা। তা না। আপনার স্বাস্থ্য তো ছিল এর চার গুন। এ অবস্থা ক্যান আপনার?

X খাড়া, কইতাছি। দাদীরে সালাম কইরা আসি। দাদী ও দাদী।

ফেরদৌসের গলার আওয়াজ পেয়ে সালমা বেগম লিপি আর মেঘলা একসাথে উঠানে এসে দাঁড়ায়।

X কেরে, ফেরদৌস? তুই ভাই এত দিন পর কোথা থেকে? সালমা বেগম প্রশ্ন করে।

X একি চাচা তোমার একি অবস্থা? উপর্যুপরি লিপি প্রশ্ন করে।

X কইতাছি কইতাছি দাদি। একটু দম নিয়া নেই। হাফাচ্ছে ফেরদৌস।

X পরশু দিন মতলব হাজীর ব্যাডা মাকখনের সাথে দেহা। তে মাকখন কইল ছোড গ্যাদা আইছে। আপনের নাতিনরে কইলাম চাইলের গুড়া কুটতে। তাই একটু চাইলের গুড়া, মুড়ি আর পাটালি গুড় আর নাইরকেল হে হে।

X আচ্ছা খুব ভাল করেছিস ভাই। আয় ভেতরে আয়।

হাবিব এখনও দরজায় দাঁড়িয়ে, চোখে মুখে ইশারা দিচ্ছে তাড়াতাড়ি করার জন্য।

X চাচা, আপনে থাকেন আমি ফিরে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলব।

X থাকেন মানে। তোর চাচীর কাছ থিকা একবারে বিদায় নিয়া আইছি। তোর বিয়া শাদীর ঝামেলা শ্যাষ কইরা তারপর যামু।

রাস্তায় বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকায় দ্রোহী।

X কিরে তোর গাড়ি কোথায়?

X গাড়ি? মান্নানের গ্যারেজে রেখে এসেছি।

X মান্নানের গ্যারেজে মানে।

X আরে মান্নান আমার এক ইয়ার লোক। হাটখোলা মোড় থেকে জ্যাম শুরু, শেষ হয়েছে সোহরাওয়ার্দী কলেজের মোড়ে এসে। এর মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে কি সারাদিনের মত ফেসে যাব নাকি? অভিসার হলের উল্টো দিকে আমার এক পরিচিত লোক আছে তার গ্যারেজে রেখে এসেছি। এইটুকু হেঁটে যেতে পারবি না?

X পারব না ক্যানো।

X তুই কিন্তু তোর টেলিফোন কাহিনী পুরোটা বললি না। ঋষিকেশ রোড ধরে পাশাপাশি হাটতে হাটতে প্রশ্ন করে হাবিব।

আরে রাখ তোর কাহিনী। পাবলিক আর রিক্সার ঠ্যালায় হাঁটতেই পারছিনা। গাড়িতে বসে বলব।

অভিসার হল পর্যন্ত যেতে হল না। তার আগেই উল্টোদিকে একটা বাড়ির গ্যারেজ থেকে ট্যাক্সি বের করে নিয়ে আসে হাবিব।

হাবিবের ট্যাক্সি শাপলা চত্বর ঘুরে পল্টনের দিকে ছুটে চলে।

X এবারে বল।

X এর পর বেশী কিছু না। পরের সপ্তাহে আবার মেয়েটাকে ফোন করলাম। তারপরের সপ্তাহে আবার। এক মাস দু'মাস তিনমাস।

প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার দুপুর অর্থাৎ বাংলাদেশের সময় রাত বারোটার দিকে ফোন করতাম। সারারাত কথা আর কথা। এক সময় বিয়ের প্রস্তাব দিলাম মেয়েটাকে।

বলিস কি না দেখেই?

X ছবি দেওয়া নেওয়া হয়েছে অবশ্য। কিন্তু তার খুব একটা দরকার ছিল না। সাগরিকা ছবিটা দেখেছিস?

X নাহ্। তারপর বলে যা

X বর্ষা রাজী হলো। আমার ভাই ভাবী একদিন ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করল। সব ঠিক। আমি আসলেই বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হবে এরকমটা কথা ছিল। কিন্তু আমি রওনা দেওয়ার ঠিক দু'দিন আগে ভাবীর কাছে জানতে পারলাম ওর মা মেয়ের বিয়ে এখন দেবে না বলে জানিয়েছে।

X কারণ?

X কারণ মেয়ে এখনও ছোট। আরও পড়া শোনা করবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

X হু। খুইব জটিল ব্যাপার।

X মোটেই না। আমার এক বন্ধু নাম স্যাম। তোর মতই ঞ্এধীর চালায়। সব সময় বলে ঞ্এধশব রং বধ্ং.

X কি যাতা বলিস। আমেরিকার ট্যাক্সি চালকের সাথে ঢাকার ট্যাক্সি চালকের তুলনা? কোথায় আগর তলার ষড়যন্ত্র মামলা আর কোথায় রইল তোর বাঁশতলার মাথা ফাটা মামলা।

গাড়ি গাবতলী পার হবার পর হঠাৎ যেন চারপাশটা বদলাতে শুরু করল। বাংলাদেশে আসার পর এই প্রথম সরিষা ক্ষেত চোখে পড়ল দ্রোহীর। চারিদিকে হলুদ বর্ণের ছড়াছড়ি। সত্তুর কিলোমিটার বেগে ছুটে চলা গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে হাওয়া ঢুকছে। এই তিন দিনে নিঃশ্বাসের সাথে সাথে যে ভারী একটা কিছু হৃৎপিন্ডে অনুভূত হয়েছে, ঢাকা শহর ছাড়ার সাথে সাথেই সেই ভারী ভাবটা হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিচেছ দ্রোহী কোন রকম কথা না বলে।

॥ সাত ॥

প্রীতিলতা হল খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না ওদের। হলের ফটকের কাছে গাড়ি থামিয়ে হাবিব দ্রোহীকে বলে -

X যা। গেটে যে লোকটা বসে আছে ওকে গিয়ে নাম রুম নাম্বার বললে ডেকে দিবে।

X আমার একটু নার্ভাস লাগছে দোস্ত।

X আচ্ছা তুই বোস আমি যাচ্ছি। নাম?

পুরো নাম মাহাজাবিন আক্তার, রুম নাম্বার সম্ভবতঃ ২০১ আর তা না হলে ১০২।

X এই তো মুশকিলে ফেললি।

মিনিট পাঁচেক পর ফিরে আসে হাবিব।

X কিরে কি অবস্থা?

X লোক গ্যাছে ডাকতে। গাড়ি থেকে নেমে বাইরে দাঁড়া। এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

হলের দারোয়ান হাত ইশারায় ডাকছে হাবিবকে।

X ২০১ নাম্বার রুমে এই নামে কেউ থাকে না। আর ১০২ তে তালা দেওয়া। দারোয়ান রোবটের মত উত্তর দিয়ে তার ছোট্ট কুঠুরিতে গিয়ে বসে। দ্রোহী অথবা হাবিবের সমস্যা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নেই।

X শালা মোল্লা বাড়ির বিড়ালও মোল্লা। চল দেখি বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা।

রাস্তার ধারে মাটির চুলা জ্বালিয়ে এক মহিলা ভাপা পিঠা বানাচ্ছে। সামনে বসা দুটো মেয়ে পিঠা খাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় মত্ত।

X যা দোস্ত দেখি দশ বছর আমেরিকা থেকে কি শিখেছিস। ঐ মেয়ে দুটোকে তোর সখীর পাত্তা জিজ্ঞেস করবি।

গলা খাকারি দিয়ে ইন করা শার্ট ঠিক আছে কিনা পরখ করে নেয় দ্রোহী।

X কি বলব দোস্ত?

X কি বলবি তা আমি কি জানি? আরে যা না ইয়ার।

এ এ এ ঊীপঁংব সব, আপনারা কি এই হলেই থাকেন?

হ্যাঁ? দুজনে একসঙ্গে উত্তর দেয়। মনে হল যেন কোরাশে জাতীয় সঙ্গীত গাইছে।

দু'জনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুন্দরী মেয়েটার চোখে মুখে বেশ বিরক্তি। বোঝাই যায় এ ধরনের বহু অযাচিত যুবক আর সেই সাথে বহু অযাচিত আলাপচারিতার জীবন্ত সাক্ষী এই মেয়েটা। সুন্দরী হওয়ার এই এক জ্বালা।

X আমি আসলে একটা মেয়েকে খুঁজছিলাম। কিন্তু রুম নাম্বার জানিনা।

X কি নাম মেয়েটার? সুন্দরীর পাশে বসা পুরু লেন্সের চশমা পড়া মেয়েটা জিজ্ঞেস করে দ্রোহীকে।

X ওর নাম মাহাজাবিন। ডাক নাম বর্ষা। দ্বিতীয় বর্ষ সাইকোলজী।

চশমা পরা মেয়েটা একটু মুচকি হাসে। এই মুহূর্তে মেয়েটাকে চমৎকার লাগছে।

X আসলে সেকেন্ড ইয়ারের কয়েকজনকেই আমি মুখে চিনি কিন্তু নামে চিনি না। একটু বর্ণনা যদি করেন।

X আমার কাছে ওর একটা ছবি আছে।

X কই দেখান।

বুক পকেট থেকে বর্ষার ছবিটা বের করে চশমা পরা মেয়েটার সামনে ধরে দ্রোহী।

X ও চিনেছি। এক পলক ছবিটার দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয় মেয়েটা।

ওরা সাধারণতঃ ঝঃধঃরংঃরপং উবঢ়ধৎঃসবহঃ-এর সামনে আড্ডা মারে।

X ঝঃধঃরংঃরপং উবঢ়ধৎঃসবহঃ টা কোথায়?

X এখান দিয়ে সোজা যাবেন। আংগুল দিয়ে নির্দেশ করে দেখায় মেয়েটি। সামনে পাবেন জাহানারা ইমাম হল। ডানে মোড় নিয়ে আধা কিলোমিটার হাঁটলে পাবেন ক্যাফেটারিয়া। ক্যাফেটারিয়াকে ডান পাশে রেখে পূর্ব দিকে একটু হাটলেই লাল রঙের সিরামিক ইটের বিল্ডিং দেখতে পাবেন। বাকীটুকু আপনার ভাগ্য।

X এ্যযধঃ শুড়ঁ ষবঃ সঁপয আপনার নামটা?

X ঝর্ণা।

X ঝর্ণা, আপনি জানেন হাসলে আপনাকে আদ্ভুত সুন্দর লাগে? আচ্ছা চলি এ্যযধহশং ধমধরহ.

ঝর্ণার পাশে বসা মেয়েটি অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দ্রোহীর দিকে। সুন্দরীর আঁতে ঘা লেগেছে। ওর আগামী সাতদিনের নিদ হারাম।

ঝঃধঃরংঃরপং উবঢ়ধৎঃসবহঃ-এর সামনে কোন রকম নারী জটলা দেখা গেল না। অগত্যা ডিরেকশন নিয়ে সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট এর দিকে হাটা শুরু করল ওরা। গোলাকার পৃথিবীর মত এর আর শেষ নেই। সাইকোলজী ডিপার্টমেন্ট পর্যন্ত যেতে হয় না। দূর থেকে চার জন মেয়ে ওদের দিকেই হেঁটে আসছে গল্প করতে করতে। খুব একটা কাছে যেতে হয় না, দ্রোহী চিনতে পারে বর্ষাকে।

X দোস্ত ডান দিকের মেয়েটাই মনে হচ্ছে তোর সখী।

X হ্যাঁ ঠিক ধরছিস। কিন্তু আমরা কোন কথা বলব না। ওদের পাস করে যাবো। দেখি ও আমাকে চিনতে পারে কি না।

এক পা দু'পা করে এগুচ্ছে ওরা পরস্পরের দিকে। মাটির দিকে তাকিয়ে হাটছে বর্ষা। বর্ষার ঠিক পাশ দিয়ে পাশ কেটে যায় দ্রোহী। কয়েক পা আগে বাড়তেই পেছন থেকে ডাক আসে নারী কণ্ঠের - শোনেন।

পেছন ফিরে তাকায় দ্রোহী। চোখে মুখে দুষ্টুমির হাসি।

X কিরে বর্ষা দাঁড়ালি ক্যানো? বর্ষার কোন একি বন্ধু, বর্ষার থেকে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করে।

X তোরা রুমে যা আমি আসছি।

দু'জনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে নিঃশব্দ।

X ক্যামন আছেন?

X ভাল, তুমি?

X আমাকে দেখেও না দেখার ভান করছিলেন ক্যানো?

X আমাকে কি একটু সময় দিতে পারো বর্ষা? মিষ্টি করে হাসে বর্ষা। এক গোছা অবাধ্য চুল বর্ষার চোখের সামনে বাতাসে দোল খায়। নাহারের সাথে এক্ষেত্রে বেশ মিল।

X চলেন, ঐ লেকের পাড়টাতে বসি।

X বর্ষা, আমার বন্ধু হাবিব, যাকে বলে জিগড়ি দোস্ত।

X না না ঠিক আছে তোরা গল্প কর আমি ঘুরে আসি। কখন আসব?

বর্ষার দিকে তাকায় দ্রোহী।

X আমাকে রাত আটটার মধ্যে হলে রিপোর্ট করতে হবে।

X এখন বাজে দুপুর একটা। ঠিক আছে দোস্ত আমি বরং ঢাকা থেকে ঘুরে আসি। ঠিক আটটায় হলের সামনে থেকে তোকে উঠিয়ে নেব। চলি। হ্যাভ ফান।

ঝিলের ধারে দুর্বা ঘাসের ওপর দু'জনে পাশাপাশি বসে।

X আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আমার সাঙ্গে দেখাই করবে না। আর দেখা করলেও কথা বলবে না।

X এরকমটা ভাবার কারণ?

X বারে, তোমার মা বাবা তোমাকে এখন বিয়ে দেবে না। মেয়ে এখনও ছোট। দেব নাকি নাকটা টিপে, দেখি দুধ গলে কিনা। কই কথা বলছ না কেন?

X কি বলব?

X তোমার যা ইচ্ছা। যেমন ধর হঠাৎ তোমার নাবালিকা হবার পেছনের যুক্তি এবং কারণ।

X এসব জানা আপনার জন্য কি খুব জরুরী?

X তোমার কাছে ব্যাপারটা ছেলে মানুষি, থুড়ি মেয়ে মানুষি হতে পারে কিন্তু আমার কাছে সিরিয়াস, যাকে বলে ষরভব ধহফ ফবধঃয ব্যাপার।

মিষ্টি করে হাসে বর্ষা।

X শুধু হাসিতে কাজ হবে না বর্ষা, আমি কারণটা জানতে চাইছি।

X তাহলে শোনেন। আমার বাবার এক বন্ধু আছে লসএঞ্জেলসে থাকে। আমরা তাকে বলি বেলাল আংকেল। এককালে রাজনীতি করত।

X বেলাল? মানে বিল্লা?

X বেলাল মানে বিল্লা কিনা তা কি করে বলব। আমি তো আর উরপঃরড়হধৎু না। তো যা বলছিলাম ঐ ভদ্রলোকের কাছে আপনার সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হয়েছিল। রিপোর্ট নেগেটিভ।

X ও খোদা! বিল্লা তোমার আংকেল? আর বিল্লার কাছে আমার সম্পর্কে ও পধহ'ঃ নবষরবাব রঃ.

X কথায় কথায় ইংরেজী বলবেন না। ঐ জিনিসটা আমি কম বুঝি।

X আমি জানিনা বিল্লা, থুক্কু বেলাল এম. পি ব্রাকেটে সাবেক, তোমার বাবাকে কি বলেছে। সে ব্যপারে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমার আগ্রহ হচ্ছে তোমাকে নিয়ে। ব্যাপারটা কি তুমি বিশ্বাস করেছ?

X বিশ্বাস করার কোন কারণ আছে কি?

X প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন করার অভ্যাসটা ছাড়ো। সরাসরি উত্তর দাও।

X না বিশ্বাস করিনি।

X কিন্তু তোমার মা বাবা?

X উনাদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। বিদেশে থাকা, বিশেষতঃ আমেরিকা প্রবাসী বাঙ্গালী ছেলেদের সম্পর্কে ---, একে তো নাচুনি বুড়ি তার ওপর ঢোলের বাড়ি।

X তা ওরা বিশ্বাস করল তুমি করলে না কেন?

X সব কিছুর পেছনে কেন শব্দটা সেট করবেন না। সব কিছুতে লজিক থাকে না। আর থাকলেও মানুষ হয়ত বুঝতে পারে না। -ও হো আমি ভুলেই গেছিলাম। তুমি তো আবার মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী।

X চা খাইবেন মামা, চা খাইবেন খালা?

দশ বারো বছরের একটা ছেলে ওদের পাশে এসে দাঁড়ায়। ডান হাতে চায়ের বড় ফ্লাস্ক। বাহাতে এক বালতি নোংড়া পানি। পানিতে ডোবানো কয়েকটা আনূবীক্ষনিক চায়ের কাপ।

X চা খাবে নাকি?

X না হ্-।

X কেন গায়ের রং কালো হবে সে জন্য?

X আমার জানা ছিল না যে চা খেলে গায়ের রং কালো হয়। আমি কখনও চা খাইনা। তবে আজকে খাবো। আমার গায়ের রং তো কালো। তাই বিষে বিষে বিষক্ষয় যদি হয়। এখন থেকে কাঁচা হলুদের বদলে চায়ের পাতা গায়ে মাখব বলে ঠিক করলাম।

চা টা অত্যাধিক ঘন। চমৎকার স্বাদ। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে প্রকৃতির ডাক নিয়ে। ভয়ে ভয়ে চায়ে চুমুক দেয় দ্রোহী। সেই সাথে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে।

X দেখি দেখি এটা কি সিগারেট। প্যাকেটটা তো খুব সুন্দর।

X মার্লবোরো লাইটস।

X আহা দেখিই না।

দ্রোহীর হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে বর্ষা।

X বাহ্ সুন্দর তো। আচ্ছা একটা বাজি হয়ে যাক। আমি এই প্যাকেটটা ঢিল দিয়ে ঐ যে পাখিটা সাঁতার কাটছে দীঘির একেবারে কিনারে, ঐটার গায়ে লাগাবো। যদি লাগাতে পারি তবে আপনি আমাকে কি দেবেন? আর না পারলে আমি আপনা- আ আ

X ঠিক আছে ঠিক আছে আমি জানি তুমি ছোট বেলায় খুব ডানপিটে ছিলে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মার্বেল খেলতে।

X না মোটেই না। ঢিল টা ছোড়ে সেই সাথে বর্ষা।

প্যাকেটটা পাখির গায়ে লাগে না। একটা পদ্ম পাতার পাশে পড়ে ভাসতে থাকে।

X আমি হেরে গেছি। বলেন কি চান?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে দ্রোহী।

X কিছু না।

X রাগ করলেন?

X নাহ্। তবে জানতে ইচ্ছে হচ্ছে প্যাকেটটা তুমি কোন অধিকারে ছুড়লে? আর আমার সিগারেট খাওয়া বা না খাওয়ায় তোমার কি-ই বা আসে যায়?

X জানি না।

হাঁটুতে থুতনি রাখে বর্ষা। বা হাত দিয়ে একটা দূর্বাঘাস কুটি কুটি করে ছেড়ে। কাছের মসজিদ থেকে আসরের আযান ভেসে আসে। বঙ্গ ললনার স্বভাব জাত সেই ঘোমটা টানা । লাল রঙের সুতির ওড়না দিয়ে মাথায় কাপড় দেয় বর্ষা। হাতের কাচের চুড়িগুলো রিনি ঝিনি শব্দে মিষ্টি তরঙ্গ ছড়িয়ে দেয় শীত বিকেলের অলস বাতাসে। বর্ষার হাতের তালুতে জোড়া মেহেদী। সাধারণতঃ বিয়ের কনেরা জোড়া মেহিদী পরে। খুব জানতে ইচ্ছে করে দ্রোহীর মেহেদী পরেছে কেন বর্ষা। কিন্তু জিজ্ঞেস করে না। অলস ভঙ্গিতে বসে থাকে। বাতাসে মিষ্টি গন্ধ। অদূরে শীতের পাখীরা দিনের শেষে রোদ্দুর টুকু ডানায় মেখে নেয়। ঘাস ফড়িংয়েরা এ-ঘাস থেকে ও ঘাসে অবিরাম ছুটোছুটি করে। হঠাৎ কোত্থেকে একটা মাছরাঙ্গা উড়ে এসে ঝিলের পানিতে ডুব দেয়। পর মুহূর্তে একটা ছোট মাছ ঠোঁটে করে পানিতে উঁচু হয়ে থাকা শ্যাওলা পড়া ঝাটার ওপর বসে। মাথার ওপর গাছের ডালে এক ঝাঁক চড়ুই আর শালিকের কিচির মিচির উৎসব। পশ্চিম আকাশে রক্ত জবার মত সূর্য ঝিলের ওপারে ছেলেদের হলের পেছনে গিয়ে হঠাৎ টুপ করে ডুবে যায়।

॥ আট ॥

ঢাকায় আসার পর থেকে একটা জিনিস অস্বাভাবিক ঠেকছে দ্রোহীর। তা হচ্ছে মশার সংখ্যা একেবারেই কম। রাতের বেলা মশারী ছাড়াই শোয়া যায়। তবে ফুল স্পীডে ফ্যান ছেড়ে দিতে হয়। শীতের দিনে ফুল স্পীডে ফ্যান আর নতুন লেপ মুড়ি দিয়ে মুখ সহ ঢেকে শোয়া। একেবারে তামাক আর ফিলটার দু'জনে দু'জনার।

ঘুম ভেঙ্গেছে সেই কোন সকালে দ্রোহীর। কিন্তু আলসি ভেঙ্গে উঠতে মন চাইছে না।

ফ্যানের সুইচ বন্ধ করার আওয়াজ পাওয়া যায়। লেপের নীচ থেকে মাথা বের করে তাকায় দ্রোহী।

X কিরে তুলতুল। পুতুলকে এখনও আঁদর করে তুলতুল ডাকে দ্রোহী।

X ছোত মামা তুমি এই শীতে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে ঘুমাও? ঠাণ্ডা লাগলে বুঝবে মজাটা।

X লাগবে না। আচ্ছা পুতুল ঢাকা শহরে মশা একেবারে কমে গ্যাছে, তাই না?

X এই মাত্র ক'দিন হলো। গত সপ্তাহে মেয়র টিভিতে অনেক কিছু বলল। মশার ব্যাপারে বেশ কিছু পদক্ষেপ নাকি ভদ্রলোক নিবে। কয়দিন আর। মাস ঘুরতেই দেখবে।

মনে মনে ধন্যবাদ জানায় দ্রোহী মেয়রকে। মেয়রের সঙ্গে দেখা করে এক প্যাকেট মার্লবোরো সিগারেট দিয়ে আসার ইচ্ছাও জাগে দ্রোহীর মনে। ভদ্রলোক ধুমপান করেন কিনা কে জানে। হাবিবকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

ওঠোতো মামা, বিছানা গোছাবো। আর নীচে দেখো গে ফেরদৌস নানা ইয়াবড় একটা মাছ নিয়ে এসেছে। সেই সাথে দুই হাত দিয়ে মাছের আকার দেখানোর চেষ্টা করে পুতুল।

ফেরদৌস চাচার কথা একদম খেয়াল ছিল না দ্রোহীর। সেই যে কালকে সকালে এক ঝলক। এর পর আর দেখা হয়নি। উঠানে এসে দ্রোহীর চক্ষু একেবারে চড়ক গাছ। বিরাট বড় এক পাংগাশ মাছ উঠানে পড়ে আছে। বাড়ির সবাই মাছটাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

X এত্ত বড় মাছ? কোথা থেকে আনলেন চাচা?

X তোর জইন্যে আনছিরে বাজান। কাইল দাদী কইল ও ফেরদৌস, বড় মাছ পাই কই বলতো। তা আমি কইলাম আরিচা ঘাট ছাড়া আর কোন জায়গায়? তাই রাইতে চইলা গেলাম আরিচা। আয়নাল আড়ৎদার আমারে বহুত খাতির করে। হ্যার পোলার বিয়ার বর যাত্রীই তো গেলো আমার লঞ্চ সুলতানে। তা আয়নাল কইল বাপু তুমি অইলা আমার নিজের লোক। পাইকারী দর থাইক্যা দশ ট্যাকা কম দিও। আরও কিছুক্ষণ ফেরদৌস চাচা আয়নাল আড়ৎদারের বৃত্তান্ত বয়ান করতে থাকে।

X তা চাচা মাছটা কত হল?

X আয়নাল আড়ৎদার কইল মাছটার পাইকারী দর আছে বারোশো। তা বাপু তুমি আমারে এগারোশো নব্বই দিও।

হো হো করে সবাই হেসে ওঠে ফেরদৌসের কথা শুনে।

জামা কাপড় পরে হাবিবের জন্য অপেক্ষা করছিল দ্রোহী। ভেজা লুঙ্গি ছাদে মেলে দিয়ে ফেরদৌস ঘরে ঢোকে খালি গায়ে। কংকালের মত লাগছে দেখতে। অথচ শেষবার যখন দেখেছে মনে পড়ে দ্রোহীর, ইয়া স্বাস্থ্য ছিল ভদ্রলোকের।

X বাজান তোর কাছে বিদেশী নোখ কাটার মেশিন আছে? আর খাউজানি চুলকানির ওষুদ?

X সব আছে চাচা কিন্তু আগে বলেনতো আপনার শরীরের এ অবস্থা কেন?

X জানিনা। গত এক বছর যাবতই রাইতে রাইতে জ্বর আসে। পরথমে আমাগো পান্নু ডাক্তারের কাছে গেলাম। তাতে কাম অইল না। পরে নাগরপুরে এম বি বি এস দেখাইলাম। সে কইল ঢাকায় গিয়া চেক করাইতে। আর সময় করতে পারি নাই। এরই মাঝে গত তিন মাস হইল শইলডা একেবারে ভাইঙ্গা গ্যাছে। সবাই কয় বান মারছে। ক দেহি বাজান আমারে বান মারব ক্যাডা। তা ভাবতাছি এবার পিস্সু কবিরাজের কাছে যামু। পিস্সু কানার কথা মনে আছে তোর? সাহাজাদপুরের, সেই যে ছোট বেলায় তোরে একবার কান্দে কইরা নিয়া গ্যাছিলাম।

X হ্যাঁ মনে আছে চাচা। তা এখন কি করেন?

X ত্যামন কিছুই না। টুকিটাকি জমি জমা চাষ করি। তোর চাচী সলিমাবাদ প্রাইমারী স্কুলে মাষ্টারী করে।

X কি যেন লঞ্চের কথা বলছিলেন তখন।

X ও হো - এম ভি সুলতান? উত্তর পাড়ার শিকদার বাড়ির বড় ব্যাটা তৌফিক শিকদারের সাথে ভাগে লঞ্চ চালাইছি বছর দুয়েক, আরিচা দৌলদিয়া ঘাটে। তা আমি তো বাজান হিসাবপত্র রাখি নাই। বিজন্যার ঘরের বিজন্যা আমারে একে বারে পথে বসাইছে। ঐ ট্যাকাডা দিয়া যদি ডিপ টিউবয়েল কিনতাম নইলে আইজকা ----

কথা বলতে বলতে কপালে হাত দেয় ফেরদৌস। অদৃষ্টকে অভিসম্পাত করে বোধ হয় একটু।

X চাচা আপনি ভাইয়ার সঙ্গে কথা বলে বড় ডাক্তারের কাছে যাবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

X হ, বড় বাজান বিকালে যাইতে কইছে পিজি হসপিটালে আমারে নিয়া যেন কোণ ডাক্তারের কাছে যাইব। তা বাজান তোর বিয়া স্বাদীর কতদূর? আর দুই বছর পরে আসলে তোর চাচতো বোইনই একটা বিয়া করতে পারতি। হো হো হো। মেয়েডা আমার মাশাল্লা খুব লক্ষী হইছে। এইবার ক্লাশ এইটে। গার্লস স্কুলের সেকেন্ড গার্ল, আর ছেলেটা ওয়ানে।

ছেলে-মেয়ের কথা বলতে ফেরদৌসের চোখ দুটোতে মমতার ছায়া লক্ষ্য করা যায়।

আমি তোর জন্য একটা মেয়ে দেইখা রাখছি।

X তাই নাকি?

X হ। দক্ষিণ পাড়ার তালুকদার বাড়ির মেয়ে। একটা মাত্র মেয়ে। কমসে কম পাঁচশ বিঘা জমি। আর মেয়েডাও মাশাল্লা পরীর মত। ইয়া বড় বড় চোখ, চুলগুলি একেবারে কোমর পর্যন্ত। দ্যাখলে যে কারও পছন্দ অইব।

X তা তো বুঝলাম চাচা কিন্তু পাঁচশ বিঘা জমি দিয়ে কি করব আমি?

X হে হে এইডা তো মূল কথা না। মূল কথা অইছে গ্রামের একটা মেয়ে বিয়া করলে তোরা একটু গ্রাম মুখী হবি। সাত গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে খানদানি তোরা। আর তোরাই গ্রাম একেবারে ভুইলা গেলি।

X আচ্ছা ঠিক আছে সে দেখা যাবে। ওয়ালেট থেকে দু'টো পাঁচশ টাকার নোট বের করে ফেরদৌসের দিকে বাড়িয়ে দেয় দ্রোহী। চাচা এটা আপনার কাছে রাখেন। হাত ইশারায় না করে ফেরদৌস।

X না না আমি পাগল ছাগল মানুষ এত টাকা দিয়া -----

বুলেটের মত তীব্র বেগে কোথা থেকে যেন বুলেট ছুটে এসে চাচাকে জড়িয়ে ধরে। পেছনে পেছনে মেঘলা। হাতে ভাঙ্গা তালের পাখা।

X লুকাচ্ছিস কেন? আজকে তোর হাড় আমি আলাদা করে ছাড়ব।

চাচাকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরে আশ্রয়কে পাকা-পোক্ত করতে চায় বুলেট। সুন্দর একটা গন্ধ আসে বুলেটের শরীর থেকে।

X কি ব্যাপার? দাঙ্গা হাঙ্গামা ক্যান?

X ওকে আগে আমার হাতে ছাড়, তারপর বলছি।

X না আগে বল।

X মার তসবিটা ছিড়ে ফেলেছে। বড় মামা মাকে তসবিটা এনে দিয়েছিল মক্কা থেকে।

X আচ্ছা ঠিক আছে যাও। আমি দেখছি। হাতের ঝাড় না ঝাড়তে পেরে মুখে বেশ কিছুক্ষণ ঝাড়ে মেঘলা। একসময় রণে ভঙ্গ দিয়ে মেঘলা রান্না ঘরের দিকে যায়।

X বুলেট, মা যা বলল তা কি ঠিক? ওপর নীচে মাথা নাড়ে বুলেট।

X তাহলে দাদু আল্লা আল্লা করবে কিভাবে?

X বারে আমি বড় হয়ে যখন মক্কায় যাবো তখন দাদুর জন্য এরকম একটা মালা এনে দিব।

X বাহ্! চমৎকার বলেছিস তো। তোকে মাফ করা গেল। এখন চুপচাপ দাদুর কাছে গিয়ে এই কথা বলে আস।

X না চাচ্চা আমি তোমার কাছে থাকব। ঐ ঘরে গেলে বড় আপু মারবে।

X বড় আপু মারবে কেন? কি করেছিস?

X কিছু না তো।

কথা শেষ হবার আগেই পুতুল এসে হাজির।

X কই বান্দরটা কই আজকে আমি ওকে দোতলা থেকে নীচে ফেলে দিব।

X কি ব্যাপার তোর আবার কি করল?

X আমার পারফিউমটা, তুমি যেটা এনে দিয়েছ, সারা ঘরে স্প্রে করেছে। অর্ধেকটা শেষ।

কথার মাঝখানে হাত পা ছুড়ে কেঁদে ফেলল পুতুল।

X আচ্ছা ঠিক আছে তোকে আরেকটা দিব।

X ঐ টাতো মামীর।

X রাখ তোর মামী। মানুষেরই ঠিক নাই তার আবার পারফিউম।

কিছুটা আশার বাণী শুনে শান্ত হয় পুতুল। কান্না থামিয়ে হাত ইশারায় বুলেটকে বোঝায় যে বাগে পেলে তার রক্ষা নেই।

বুলেটও পাল্টা ভেংচি কাটে। প্রাথমিক অবস্থাটা সামাল দেওয়া গ্যাছে। এরপর যা হবে তা আফটার শক। এসব থোড়াই পরোয়া করে বুলেট। তবে এই মুহূর্তে চাচাকে তার খুব আপন মনে হয়।

ফোনটা বেজে ওঠে সেই সময়। দ্রোহী আসার পর ফোনের একটা এক্সটেনশন এই ঘরে টানা হয়েছে।

X হ্যালো।

X হ্যালো পচা ভাই?

X কে নাহার?

X বাহ চিনতে পেরেছ তা হলে। শোন দ্রোহী ভাই, আজকে দুপুর বারোটায় আমরা বিয়ে করছি। তুমি তোমার বন্ধু হাফিজকে নিয়ে ঠিক -----

X হাফিজ না তো হাবিব।

X ঐ হলো। হাফিজকে নিয়ে ঠিক বারোটায় মোহাম্মদপুর কাজী অফিসে চলে আসবে। আমি আর সিদ্দিক তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। ওকে? বাই-ই নাও।

বারোটার পরিবর্তে বারোটা তিরিশে হাবিব আর দ্রোহী মোহাম্মদপুর কাজী অফিসে এসে দাঁড়ায়। ততক্ষণ কনে এসে গ্যাছে কিন্তু বরকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য আসলেও বোঝার উপায় নেই। কারণ দ্রোহী বা হাবিব কেউ-ই সিদ্দিককে চেনে না।

আকাশি রঙের শাড়ী পরেছে নাহার। ম্যাচকরা ব্লাউজ, কানের দুল এমন কি নাকের ফুল। নাহারের খোপায় রজনী গন্ধা। পারফিউমের হালকা কিন্তু মিষ্টি একটা সুবাস আসছে নাহারের শরীর থেকে।

X কি পারফিউম মেখেছিস রে নাহার? তোর ইদ্রিস তো একেবারে পাগল হয়ে যাবে আজকে। তবে আমার মনে হয় কি জানিস তোর ইদ্রিস আজকে আসবে না।

X একশো বার আসবে।

দোতলা কাজী অফিসের বারান্দায় পায়চারী করছে নাহার। আর মাঝে মাঝে উকি দিয়ে নীচে সলিমুল্লাহ রোডের পথচারী এবং রিক্সা যাত্রীদের লক্ষ্য করছে। ভাগ্যিস কাজী অফিসের বারান্দা ছিল এবং বারান্দায় বেঞ্চ পাতা ছিল। দ্রোহী আর হাবিব বেঞ্চে বসে আছে। হাবিবের হাতে একটা সুটকেস। সুটকেসটা অবশ্য হাবিবের না নাহারের। ভেতরে নাকি স্বর্ণালংকার আছে। হাবিবের মত একটা স্মার্ট ছেলে নাহারের সামনে একেবারে কেচো বনে গ্যাছে। সুটকেসটা দেখে রাখতে বলায় একেবারে যক্ষের ধনের মত, যাকে বলে যেতে নাহি দেব স্টাইলে ধরে রেখেছে।

কনুই দিয়ে খোঁচা মারে দ্রোহী - কিরে পাঁঠা চেহারাটা আবুল করে রেখেছিস কেন?

X ফাজলামো করিস না তো। আহারে মেয়েটার দুরাস্থার জন্য খুব খারাপ লাগছে।

X খারাপ লাগলে ঝুলে পড়।

X যাহ কিযে বলিস না। মেয়েদের মত লজ্জা পায় হাবিব।

পায়চারী থামিয়ে বারান্দার এক কোনায় দাঁড়িয়ে উদাস ভঙ্গিতে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে নাহার। এক পা পেছন দিকে ভাঁজ করে দেয়ালে ঠেস দেওয়া।

হাত ইশারায় ডাকে দ্রোহী নাহারকে।

হাবিব আর দ্রোহীর মাঝখানে বসতে বসতে বলে কি বলবে বলো। সেই সাথে বা হাত দিয়ে চোখের সামনে আসা অবাধ্য চুল সরায়।

X ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখতো, কাজটা কি করা ঠিক হয়েছে?

X আমি কোন কাজ ভেবে করিনা। যখন যা মনে আসে তাই করি।

আজকে নাহার প্রথম থেকেই হাসছে না। তাই লক্ষ্মী দাঁতগুলো চোখে পড়ছে না। কিন্তু একটা তাজা লাল গোলাপ থেকে একটা দুটো পাপড়ি এদিক ওদিক পড়ে গেলে গোলাপের কি-ই বা যায় আসে। হাস্যরত নাহার আর ব্যথা ভারাক্রান্ত নাহার, লক্ষ্মী দাঁত বের করা নাহার আর লক্ষ্মী দাঁতহীন নাহার, পার্থক্য উনিশ আর উনিশ দশমিক শূন্য এক।

X তোকে খুব সুন্দর লাগছে আজকে।

X আজকে কেন? আমি সবসময়ই সুন্দর। মাথা নীচু করে উত্তর দেয় নাহার।

X বাহ্ চমৎকার বলেছিস তো। যা বলছিলাম, চারটে তো বেজে গেল প্রায়। তুই কি একবার ভেতরে গিয়ে কাজী সাহেবের কাছে গিয়ে খোঁজ নিবি। কাজী সাহেব তো আবার সিদ্দিকের খালাতো ভাই হয়।

X আসার পরেই খোঁজ নিয়েছিলাম। এই নামে কেউ আসেনি। তাছাড়া ভদ্রলোক বললেন নরসিংদির তামাম লোকই নাকি তার আত্মীয় হয়। সিদ্দিককে নামে চিনলেন না, তবে বাবার নাম বললে নাকি অবশ্যই চিনবে। কিন্তু আমি তো ওর বাবার নাম জানি না।

X এ্রধশব রঃ বধংু. কথাটা কে বলে জানিস?

X দ্রোহী ভাই তোমার রসিকতা আমার মোটেও ভাল লাগছে না। তুমি দয়া করে বাসায় চলে যাও। আমি হাফিজ সাহেবকে নিয়ে চলে যাবো। কি? পারবেন না হাফিজ সাহেব আমাকে একটা লিফট দিতে। হাবিবের দিকে ঘুরে প্রশ্ন করে।

X ঝঁৎব গধফধস.

X আমাকে দয়া করে গধফধস বলবেন না। নিজেকে নেত্রী নেত্রী মনে হয়।

X ঙশ গধফধস আর বলব না।

॥ নয় ॥

হাবিব আর নাহার সলিমুল্লাহ রোড ধরে আসাদ গেটের দিকে রওনা করে। ওরা চলে যাওয়ার পর দ্রোহী নিজেও আর দাঁড়িয়ে থাকে না। হাঁটা শুরু করে। রিক্সা বা স্কুটারে চড়ার ইচ্ছে করছে না। আজকে সে হেঁটে যাবে বলে ঠিক করে। মোহাম্মদপুর থেকে বাংলাবাজার আজকের কথা না। তা যাই হোক এই তো এতটুকু ঢাকা শহর।

এদিককার রাস্তাঘাট খুব একটা মনে নেই দ্রোহীর। তবুও মোটামুটি একটা দিক ঠিক করে হাঁটতে থাকে সে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে চারিদিকে। ডিসেম্বরের শেষ প্রায়। ভরা শীতের সময়। তবে দ্রোহীর কাছে খুব একটা শীত লাগছে না। আধা ঘন্টা হাঁটার পর শরীর বেশ গরম হয়ে এসেছে। কোথা দিয়ে কোন দিকে যাচ্ছে কিছুই ঠাহর করতে পারছে না দ্রোহী। তবুও সে কাউকে না জিজ্ঞেস করে আপন মনে হাঁটছে। কখনও বা রাজপথ কখনও বা আবাসিক এলাকা দিয়ে হাঁটছে সে। আগে মোড়ে মোড়ে ভিডিও ক্লাব চোখে পড়ত। এখন একেবারেই নেই। অবশ্য তার দরকার পড়ে না ঘরে ঘরে ডিশ এ্যান্টেনা আর হিন্দি ছবির মাতম। চারিদিকে যে হারে হিন্দি গান চলছে তাতে ক'দিন পর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গাইতে বললে হয়ত গেয়ে উঠবে ঃ

মেরা সোনার বাংলা

ম্যায় তুমকো প্যায়ার করি ই ই ই।

আপন মনে হাসে দ্রোহী। উল্টো দিক থেকে একটা যাত্রীবাহী রিক্সা দেখা যায়। রিক্সায় তিনটি মেয়ে, মেয়ে না ঠিক তন্বী যাকে বলে। মেয়েগুলো দ্রোহীর দিকে তাকিয়ে, একে অপরের গা টিপে খিল খিল করে হেসে ওঠে। কলেজ জীবনে বন্ধুরা মিলে রিক্সায় তিন জন ওঠাটা বেশ মজার একটা ব্যাপার ছিল। আর সেই সাথে হাসি মস্কারা, মেয়েদের দেখে টুকিটাকি মন্তব্য (অবশ্য ভদ্রচিত)। এই যুবতীরাও ঠিক ঐ রকম একটি সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ওদের গলার স্বর এখন ডেকি মুরগীর মত। ক ক ক ক করবে আর আন্ডা দেবার জায়গা খুঁজবে। এখন যৌবন যাদের সময় তাদের এক রিক্সায় তিন জন ওঠার। আর চলতি পথে যদি কোন যুবককে একা একাই হাঁসতে দেখে তাহলে তো মজার ব্যাপার বটেই। দ্রোহীকে পাগল টাগল ভেবেছে বোধ হয়। ভাবুক গে।

মেয়েগুলোর চিন্তা ঝেড়ে আবার হাসতে থাকে দ্রোহী। রিক্সার টুং টুং ঘন্টা, স্কুটারের কালো ধোঁয়া, সেকেন্ড গিয়ার বড় জোর থার্ড গিয়ারে পি পি পি হর্ণ বাজিয়ে চলা নতুন মডেলের গাড়ী, বাঁদর ঝোলা অফিস যাত্রীদের নিয়ে ছুটে-চলা মিনি বাস, অথবা কাঠ বডি। রাস্তার দুই ধারে বিশাল বিশাল রাজপুরী। সবচেয়ে চোখে পড়ার মত যে জিনিস তা হচ্ছে ঘন ঘন কম্পিউটার লার্নিং অথবা ট্রেনিং সেন্টার। এ পর্যন্ত ত্রিশটি কম্পিউটার স্কুল চোখে পড়েছে দ্রোহীর। এই মুহূর্তে যে স্কুলটির পাশ দিয়ে যাচ্ছে এর নাম ইউ এস এ নেট কম্পিউটার লার্নিং সেন্টার।

দীর্ঘ দশ বছর ধরে কল্পনা করতে করতে ঢাকা শহরের একটা ছোট খাটো ম্যাপ দ্রোহীর হার্ড ডিস্কে সেট করা আছে। এই

ম্যাপে অবশ্য গাণিতিক স্কেল বা কনটওর এই জাতীয় কিছুই ব্যবহার করা হয়নি। এই ম্যাপের প্যারামিটারগুলো দ্রোহীর নিজস্ব ইনভেনশন।

আচ্ছা একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। মনে মনে বলে দ্রোহী। এখন যে চৌরাস্তাটায় দ্রোহী দাঁড়িয়ে আছে এই জায়গাটা চেনার জন্য দ্রোহীর ফর্মূলা কাজ করে কি না। রাস্তার মাঝখানে একটা মিশুক। ওষুধ ওষুধ গন্ধ, উল্টো দিকে লাল রঙের যাদুঘর ভবন। নিশ্চয়ই শাহাবাগ, পি জি হসপিটাল। থুক্কু পি জি হসপিটাল না বঙ্গবন্ধু হসপিটাল। যে হারে বঙ্গবন্ধুর নামে জিনিস হচ্ছে কবে যেন শোনা যায় পাবনা পাগলা গারদের আর টান বাজার পতিতালয়ের নামও পরিবর্তন হয়ে ইয়ে হয়েছে।

আর হাঁটতে পারছে না দ্রোহী। ক্ষুধা লেগেছে প্রচুর সেই সাথে পানির পিপাসা। তারপরও থামেনা সে হাঁটতে থাকে। একেবারে টিএসসিতে গিয়ে থামবে বলে আরেকটু জোরে পা বাড়ায়।

শীতের রাতে আটটার মধ্যে ঢাকা শহরের অনেক জায়গায় নীরব হয়ে গেলেও টিএসটি এখনও সরগরম। জোড়ায় জোড়ায় যুবক যুবতী বসে আছে। হাতে চটপটির প্লেট বা চায়ের কাপ অথবা বাদামের প্যাকেট। ডাসের চার পাশে অত্যাধিক ভিড় আর তাছাড়া জোড়া জোড়া, (তা সে ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন)। ঐ জায়গাটাতে বসা কেমন যেন বেমানান লাগে দ্রোহীর কাছে। অগত্যা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেটের কাছে দূর্বা ঘাসের ওপর ল্যাটা মেরে বসে।

টি এস সির বর্তমান চিত্র দেখে কেউ ধারণাই করতে পারবে না যে এখানে ওয়েস্টার্ন স্টাইলে বন্দুক যুদ্ধ হয়। কোথায় বৃন্দাবনের লীলা ক্ষেত্র আর কোথায় পানি পথের যুদ্ধ ক্ষেত্র। তবে বৃন্দাবন দেখতে হলে আমেরিকার হাইস্কুলগুলোর সামনে ছুটির আগে বা পরে যেতে হবে। সে এক দেখার মত দৃশ্য।

কথায় আছে আজকে বিলেত, আমেরিকায় যা হয় বাংলাদেশে হয় তার একশ বছর পর। বৃন্দা বনের লীলা খেলা বাংলাদেশে হলেও একটু গোপনে হয়। ভয়াবহতাও তেমন নেই। কিন্তু ওখানকার বৃন্দাবনগুলো ভয়াবহ। সেই জন্য বৃন্দাবন কর্তৃপক্ষ ফ্রি কনডমের ব্যবস্থা করেছে। বৃন্দাবনের লীলা খেলায় যে এইডস নামের ভয়াবহ দানব দাবানল জ্বালায়, তা বালক বালিকাদের ভাল করে শিখিয়ে দেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের বৃন্দাবনগুলোর বর্তমান অবস্থা কেমন তা ভাবে রকিব। স্যাটেলাইট, কম্পিউটার আর ডিশ এন্টেনার যুগ। একশ বছর লাগার কথা না সংক্রামিত হতে। তা সংক্রামিত হলোই বা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে ফ্রির ব্যবস্থা করতে পারে।

সরকার প্রয়োজনবোধে নতুন একটা মন্ত্রণালয় খুলতে পারে। নাম দেয়া যেতে পারে কনডম মন্ত্রণালয়। একটা মন্ত্রণালয় মানে একজন মন্ত্রী বাড়া। একজন মন্ত্রী মানে একজন কুত্তা, থুরি থুরি কুত্তা না শের-ই-কুত্তা। আর এক শের-ই-কুত্তার পিছনে শত শত নেড়িকুত্তা। বলবে নাকি দ্রোহীর পিরকল্পনাটার কথা প্রধান মন্ত্রীর কাছে? প্রধান মন্ত্রি নাকি মাঝে মাঝে তার মত নগেন খগেনকে দেখা দেন। তা হঠাৎ যদি এমন একটা বার, ক্ষণ, লগ্ন মিলেই যায় কথাটা পেড়েই ফেলবে সে মাথা মন্ত্রীর কাছে। পরদিন পত্রিকা গুলোতে ছোট ছোট হরফে ছাপা হবে।

<u>প্রধান মন্ত্রী সকাশে দ্রোহী ইসলাম</u>

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফেরত বিশিষ্ট চিন্তাবিদ জনাব দ্রোহী ইসলাম গতকাল প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে তিনি প্রধান মন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কনডম ব্যবহার এবং উহা বিনা মূল্যে বিতরণের বিশাল প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। ইহা ব্যবহার ও বিতরণের সুবিধা অসুবিধা দেখে ভাল করার জন্য একখানা পৃথক মন্ত্রণালয় খুলার আহব্বান জানান। প্রধান মন্ত্রী মনযোগের সাথে জনাব ইসলামের কথা শোনেন এবং তাকে এই মর্মে আশ্বাস দেন যে মন্ত্রণালয় খোলা হবে কেননা ইহা তাঁর পূর্ব পুরুষের স্বপ্ন ছিল। কোন কোন পত্রিকায় ছবিও ছাপা হতে পারে। হাস্যরত প্রধান মন্ত্রীর সাথে বিজ্ঞের মত দাঁড়িয়ে দ্রোহী। অবশ্য এ জন্য তাকে কিছু পয়সা কড়ি খরচ করতে হবে।

পত্রিকায় এ খবরটি বের হবার সাথে সাথেই জাহেলি কান্ড ঘটে যাবে। পরদিন, তার পরদিন এবং তারপর অনেক অনেক দিন পাতা জুড়ে শুধু কনডম মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত খবর। পত্রিকার হেডিংগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে দ্রোহীর।

<u>প্রধান মন্ত্রীর দুঃশ্চিন্তা, বিরোধী দলের হুশিয়ারী</u>

গতকাল প্রধান মন্ত্রী ব্যস্ততা এবং দুঃশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে দিবা নিশি অতিবাহিত করেন। প্রধান মন্ত্রী এখনও কনডম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সমর্পনের জন্য উপযুক্ত মন্ত্রবাজ খুঁজিয়া পান নাই। তবে উক্ত মন্ত্রণালয়ের পানি প্রার্থীরা ইতিমধ্যে লবিং শুরু করেয় দিয়েছেন। লবিংকারীদের মধ্যে ঐকমত্যের সরকারে যোগদানকারী একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হইতেছে। ওদিকে ছাগল নাইয়ায় এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দান কালে বিরোধী দলীয় প্রধান বলেন যে, উক্ত মন্ত্রণালয় লইয়া কোন রকম টাল-বাহানা তারা সহ্য করবে না। সরকারি দল এই মন্ত্রণালয় খোলার কৃতিত্ব একক ভাবে দাবি করতে পারে না। কেননা তাঁরা যখন মসনদে ছিল তখনই এই ব্যাপারে প্রথম প্রাথমিক খসড়া হয় এবং এই মর্মে পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু তৎকালীন বিরোধী দল অহেতুক কিছু সমস্যা লইয়া মাথা ঘামায় এবং বিনামূল্যে কনডম বিতরণের পরিকল্পনা চলমান আন্দোলনে পদদলিত হয়। বিরোধী প্রধান হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের কৃতিত্ব সরকার একক ভাবে দাবি করলে এই সরকারের পতন অনিবার্য।

<u>৫১ জন বুদ্ধিজীবী সংযুক্ত বিবৃতি</u>

দেশের ৫১ জন স্বনাম ধন্য বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে কনডম বিতরণের মত ন্যাক্কার জনক প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন। উহাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোই সমস্ত গণ আন্দোলনের উৎস। ছাত্ররা হইতেছে শৌর্য বীর্যের প্রতীক।

সেই বীর্য যথাস্থানে না প্রয়োগ করিয়া প্লাষ্টিকের থলেতে নির্গত করিলে রাজাকারদেরই কেবল বিজয় হইবে। এই ধরনের পরামর্শ দাতা ব্যক্তি রাজাকার ব্যতীত আর কেহই নহে।

দেশের ১০১ জন বিশিষ্ট ওলামায়ে একরামের সম্মিলিত বজ্র হুংকার

১০১ জন বিশিষ্ট আলেম এক যুক্ত বিবৃতিতে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জন্ম নিয়ন্ত্রণের মত নাজায়েজ সংস্কারের চর্চা এবং বিনামূল্যে ইহার উপকরণ সরবরাহের পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আলেমবৃন্দ বিলেত ফেরত ডঃ দ্রোহী ইসলামকে মুর্তাদ ঘোষণা এবং তাহার মস্তকের মূল্য এক লক্ষ দিরহাম নির্ধারণ করিয়া সকল ধর্ম-প্রাণ মুসলমান ভাইদের মালকোঁচা মারিয়া এবং তরবারি উচাইয়া জেহাদে ঝাপাইয়া পড়িবার বজ্রকণ্ঠ আহব্বান জানাইয়াছেন।

সংসদের বাহিরে গোলাগুলি, তিনজন এম,পি এবং একজন মহিলা এম, পির স্ব-স্ব আসনে মলত্যাগ। কনডমের টেন্ডার লইয়া টানাটনি। নিহত-৭ আহত ০

আর ভাবতে পারেনা দ্রোহী। কি আলীশান আর সময়োপযোগী একটা প্ল্যান সে পাঁচ মিনিটে করে ফেলল। বাংলার মানুষের দরকার জ্বালাও পোড়াও করা আর সুযোগ পেলে রক্ত দিয়ে ধন্য হওয়া। তা সে সুযোগ তারা পাবে। নেতা নেত্রীদের দরকার লাশের। লাশ দরকার পড়লে পায়ে হেঁটে নেতাদের বাড়ির দরজায় খট খট করবে। দারোয়ান অর্ধচন্দ্র দিলেই বা শোনে কে? মুর্দার আবার আত্মসম্মান। আর দ্রোহী? মাথায় মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে থাই বা সিঙ্গাপুর এয়ারে চড়ে, সোজা নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্ট। কাগজের জন্য যেখানে দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে সেখানে এয়ারপোর্ট থেকেই রাজার সম্মানে আশ্রয় দেবে তাঁকে তথাকথিত মানবাধিকারের ধ্বজা ধারীরা।

রাত দশটা বেজে গ্যাছে। এখন আর হাঁটতে মন চাইছে না। জটলা করে রিক্সা ওয়ালা বসে আছে। কেউ কেউ চায়ের কাপে বা বিড়িতে ফু দিয়ে শরীরটাকে গরম করে নিচ্ছে।

- কই যাইবেন বাই। চ্যাংড়া রিক্সাওয়ালা জিজ্ঞেস করে দ্রোহীকে। দ্রোহী সাধারণ বুড়োমত রিক্সাওয়ালার রিক্সায় চড়ে। বুড়োরা সারা দিন বেশী ক্ষ্যাপ পায় না। জোয়ানদের সাথে তাল মিলিয়ে প্যাডেল চালাতে পারে না বলে হয়ত। বেশীর ভাগ মানুষই বুড়ো রিক্সাওয়ালার রিক্সায় চড়তে চায় না। অবশ্য স্বল্প বেতনের চাকুরীজীবীরা যখন তাদের সন্তান সম্ভবা স্ত্রীদের নিয়ে ডাক্তারখানায় যায় তখন বেছে বুছে বুড়োর রিক্সায় সওয়ার করে। দ্রোহীর সঙ্গে প্রেগনেন্ট মহিলাদের এক্ষেত্রে বেশ মিল আছে যদিও কারণ ভিন্ন। বৃদ্ধ এক রিক্সাওয়ালা পেয়েও যায় সে।

গজেন্দ্র গতিতে রিক্সা চালাচ্ছে বুড়ো মিয়া। আশে পাশের দোকান পাটগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে গ্যাছে। তবে বংশাল রোডের ওপর হোটেলগুলো এখনও খোলা। গরম গরম পরটা আর চপ ভাজা হচ্ছে। দ্রোহীর রসনা কিছুটা সিক্ত হয়। কিন্তু নিজেকে দমন করে সে। চটপটি, ফুচকা, ঘন দুধের চা, ঝাল মুড়ি একসাথে অনেক পড়ে গ্যাছে। এতটা সাহস দেখানো ঠিক না। মহাখালী ডায়েরিয়া হসপিটালে সিট পেতেই নাকি পাঁচ হাজার ঘুষ দিতে হয়। বরং চাচা মিয়ার সাথে গল্প করা যায়।

- কোথাকার গাড়ি চাচা মিয়া।

- ধোলাইখালের। রিক্সাওয়ালাদের কোথাকার রিক্সা না বলে কোথাকার গাড়ী বললে সাধারণতঃ বেশ খুশি হয়। বিগলিত হয়ে গ্যারেজের কথা, মালিকের কথা, তার সুখ দুঃখের সাতকাহন বয়ান করতে থাকে। নিজেকে নগন্য রিক্সাওয়ালা না ভেবে গাড়ীর চালক ভেবে কিছুটা তুষ্টি লাভ করে হয়ত। সে হিসাবে ট্রাক বা বাস ড্রাইভারদের কোথাকার উড়োজাহাজ বললে মহাখুশি হওয়ার কথা। এক দিন সুযোগ বুঝে কোন ট্রাক চালককে ডোজটা দিয়ে হাইপোথিসিসের যথার্থতা যাচাই করতে হবে। তবে ট্রাকের কাছে যাওয়াটাই যা একটু বিপদজনক।

বুড়ো রিক্সাওয়ালা খুশি হলো না বেজার হলো তা অবশ্য বোঝা গেল না।

X এই বয়সে গাড়ী চালান শরীরে কুলায়?

X প্যাট কি আর বয়স মানে বাজান? জোয়ান মর্দ ছাওয়ালডা এক দিনের ভ্যাদ বমিতে শ্যাষ হয়া গ্যালো। বউডা অন্য জায়গায় নিকা বইল। পাঁচ বছরের নাতিডা রাইখ্যা গেল আমার কাছে। তা বইব বা না ক্যা। কাঁচা বয়স ছিল। নিজের জমি নাই, এর বাড়ি ওর বাড়ি কামলা দিয়া খাইতাম। এহন কেউ আর কামও দিবার চায় না। নাতিনডাও বড় হয়া গ্যাছে। বিয়া স্বাদী দিবার পারলে শান্তিতে মরবার পারতাম।

X বিয়ে দেননা কেন?

X ট্যাকা পামু কুনে? একখান ছাওয়াল পাইছিলাম আমাগো দেশেরই। তেমন দাবি করে নাই। নিজের কিছু আছে আর আমি কিছু দিবার পারলে একটা রিক্সা করবার পারত। ছাওয়ালডা খুব বালা। এহন আল্লা জানে।

X বাড়ি কোথায়?

X গোপাল গঞ্জ।

X বলেন কি? প্রধান মন্ত্রীর দেশ?

X হ - আমাগো পরধান মন্ত্রী খুব বালা। একদম ফেরেশতা।

X ক্যান? ভাল ক্যানো?

একবার দেখা করবার গেছিলাম বরকি ঈদের সময়। আমারে কইল চাচা মিয়া ঈদ মোবারক। ক্যামন আছেন? সেমাই খাইয়া যান। তা সেমাইডাও ছিল বাফু। বড়ই সুন্দরয ।

X আর কিছু দিল না পরধান মন্ত্রী?

X আর কি দিব? তয় যারা আমাগো নিয়া গেছিল তারা কইছিল একশ কইরা ট্যাকা দিব। কিন্তুক পরে কইল মিয়া তোমারে টেলিবিশনে দেহাইছে আবার ট্যাকা কিসের? ট্যাকাডা বড় কতা না বাজান, আমার এলাকার কইন্যা দ্যাশের পরধান মন্ত্রী এইডাই বড় কথা। বাবলেই কইলজাডা বড় অইয়া যায়।

X ব্যাস ব্যাস চাচা ডাইনে রাখেন। বাসার সামনে রিক্সা থামে। ওয়ালেট ভাংতি টাকা ছাড়াও তিনটা পাঁচশ টাকার নোট। নোট তিনটা বৃদ্ধের হাতে তুলে দেয় দ্রোহী।

X এইটা রাখেন চাচা মিয়া। আর নাতনিরে জলদি বিয়া দ্যান। বলেই দরজার দিকে পা বাড়ায় সে। পেছনে তাকায়না। বুড়োর অভিব্যক্তিও দেখে না। ঘুরে তাকালে হয়ত দেখত বুড়ো কাঁদছে। লোকটাকে প্রধান মন্ত্রী ঈদ মোবারক বলেছে তাতেই সে ফেরেশতা হয়ে গ্যাছে। আচ্ছা ভবিষৎতে অন্য কোন সওয়ারীর কাছে কি লোকটি দ্রোহীর গল্প করবে? করা উচিত। কারণ সে প্রধান মন্ত্রীর মত ফেরেশতা না হলেও একজন মানুষ বটে।

॥ দশ ॥

হল থেকে ফেরার পর থেকেই শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে বর্ষার। জ্বর টর আসবে বোধ হয়। যতগুলো রোগ আছে তার মধ্যে জ্বর রোগটাই সবচেয়ে ভাল লাগে বর্ষার। বেশ একটা ঘোরের মত থাকে সারাক্ষণ। কত অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন। যার কোন মাথা মুন্ডু নেই। একটার সঙ্গে আরেকটার কোন মিল নেই। মজার ব্যপার হচ্ছে, যখন স্বপ্ন দেখে তখন সে ঠিক বুঝতে পারে যে স্বপ্ন দেখছে। দিনের বেলা যখন জেগে থাকবে তখন স্বপ্নগুলো নিয়ে একটার সঙ্গে একটা জোড়া দেওয়ার কথা স্বপ্নের মধ্যেই চিন্তা করে রাখে। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গার পর এক বিন্দু বিসর্গও মনে থাকে না তার। এবার জ্বরে কি স্বপ্ন দেখবে সে? দ্রোহীকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখলে মন্দ হয় না। মাথার ওপরে ফ্যান বণবণ করে ঘুরছে। মিল্লাত ফ্যান। অনেক আগের। বাতাসটা খুব মিষ্টি। শীতের দিনে ফ্যান ছেড়ে লেপ দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে শোয়ার এই অভ্যাসটা দ্রোহীর কাছ থেকে শিখেছে সে।

দ্রোহীর কথা মনে হতে বুকের ভেতর একটা চিড়িক দিয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে একটা ভারি কিছু, পাথর টাথর হবে হয়ত বুকের ওপর ভর করে। কষ্ট হয়, খুব কষ্ট। আজ ক'দিন ধরেই এমনটা হচ্ছে। যখনই ঐ নামটা মনে পড়ে তখনই হয়। সেদিন হঠাৎ করে হাজির। সেই মানুষটা। যার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা, রাতের পর রাত ফোনে কথা হয়েছে। একটা ছবি ছিল দ্রোহীর বর্ষার কাছে। দাঁড়ানো দ্রোহী, পেছনে প্রশান্ত মহাসাগর আর অস্তগামী সূর্য। চুলগুলো এলোমেলো। মায়াবী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে দ্রোহী। মনে মনে কতবার ঐ ছবির পাশটিতে দাঁড়িয়েছে বর্ষা। এলোমেলো চুলগুলোকে কতবার আংগুল দিয়ে পরিপাটি করে দিয়েছে। কত কথা বলেছে বর্ষা ছবিটির সাথে। সেই ছবির মানুষটি জলজ্যান্ত হাজির তার সামনে। চুলগুলো একই রকম এলোমেলো। খুব মন চেয়েছিল বর্ষার, তার কোমল হাত দিয়ে চুলগুলোকে পরিপাটি করে দিতে। মায়াবী প্রশান্ত দুটো চোখের পাতায় অধর ছোঁয়াতে । উফ মানুষের চোখ এত সুন্দর আর গভীর হয় কি করে। বিশাল এক চৌম্বক ক্ষেত্র যেন আছে ঐ চোখে। অবশ্য দ্রোহীর চোখে চোখ রেখে কথা বলার মত মুখ তার আর নেই। দ্রোহীর সামনে সে ছিল এক অপরাধী। অপরাধীরা কখনও চোখ তুলে কথা বলতে পারে না।

বর্ষাও পারেনি। শুধু উত্তর দিয়েছে যে টুকু না দিলেই নয়। সেদিন সময় যে কোথা দিয়ে গেল টেরই পাওয়া গেল না। কথা যে বলার ছিল তার কিছুই বলা হয়নি। বলা কি হবে কোন দিন? হয়তো বা না। অন্যায়টা তার নিজেরই। দ্রোহীকে সে ভালোবেসেছে। চোখের দেখায় ভালোবাসা না। বিশ্বাসের ওপর ভালবাসা। যাকে বিশ্বাস করা যায় এবং বিশ্বাস করে ভালবাসা যায় তার জন্য অন্য সব বিশ্বাসকে সমূলে উপড়ে ফেলা যায়। তার নিজের মা-বাবা দ্রোহীকে চেনে না। তাই মেয়ের বিয়ে একজন চরিত্রহীন ছেলের সঙ্গে দিতে রাজী হবে না এটাইতো স্বাভাবিক। কিন্তু বর্ষা তো চেনে?

চেনে কি সে?

একদিনের মাত্র দেখা। তা হোক না মাত্র একদিনের। ঠোঁট, দাঁত আর জিহ্বা মিলে যে কম্পাঙ্ক বাতাসে ছড়িয়ে দেয় সেগুলোই কথা। কতগুলো শব্দের সমষ্টি মাত্র। শব্দগুলো মিথ্যা হতে পারে। কিন্তু মানুষের চোখ কি কখনও মিথ্যা বলতে পারে? ঐ চোখ দুটো? অথবা হাসি, শিশুর মত নিষ্পাপ হাসি?

মানুষের নিঃশ্বাসে কি কখনও মিথ্যার বিষ মাখানো থাকে? মানুষের শিরা, ধমনী, অলীন্দ, নিলয় এগুলোকে মিথ্যা বলতে পারে। দ্রোহীর প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি নেনো সেকেন্ডের রক্ত সঞ্চালনের গতিবিধি, প্রতিটি হৃৎস্পন্দনের সাথে নিযুত কোটি যুগ ধরে পরিচিত সে।

ইস মাথাটা একবারেই গ্যাছে। নাহ্ মাথার কিছু হয়নি। একটু জ্বর। আর মাথা ব্যথা আর মাথার উপর সিলিং ফ্যান ভনভন। আসল দোষ তার রুহের। খুব নিচু মানের একজন মানুষ সে। এতই যদি আপন হয় তাহলে কেন সে বলতে পারল না যে আমি আমার মা-বাবার পক্ষ থেকে ক্ষমা চাইছি। এই যে আমি মাহাজাবিন আক্তার বর্ষা, তোমার সামনে দাঁড়ানো. যদি এখন বল এখন, কাল বল কাল, এক যুগ পরে বল বলো তো তাই। যদি বল ঘর বাঁধবে তাহলে সে ঘর আমি ফুলে ফুলে সাজিয়ে দেব। যদি বল এই গ্রহে নয় মঙ্গল গ্রহে, তাহলে পরম করুনাময়ের কাছে চাইব লাল গ্রহকে সবুজে সবুজ করে দিতে। অথবা স্থলেও না মহাশুন্যেও না সাগরে অথবা গভীর অরণ্যে, সভ্য জগৎ থেকে দূরে অনেক দূরে। আমি তাতেই রাজী।

হি হি হি। মোটেই না। বর্ষার পক্ষে এসব করাতো দূরের কথা বলাটাও হয়ত কোনদিন সম্ভব হবে না।

আচ্ছা, আমি না হয় মন্দ মানুষ। তাই বলে দ্রোহী কি করে পারল? সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে যে মানুষটা তার কাছে, এত কাছে এলো, সেই মানুষটা একদিন, মাত্র একদিন দেখা করলো। তাও তো সেই রবিবারে। আর আজকে শুক্রবার থুড়ি থুড়ি শনিবার পড়ে গ্যাছে। এই কাছে আসার চাইতে দূরে থাকাটাইতো বেশ ছিল।

হল থেকে সে ফিরেছে দুপুর বারোটায়। আসার পর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চারবার ফোন করেছে সে দ্রোহীদের বাসায়। মেঘনা ভাবী ফোন ধরেছিল। লজ্জার মাথা খেয়ে সে নিজের পরিচয় দিয়ে দ্রোহীকে একটা কল ব্যাক করতে বলেছিল। আর সে যদি কল নাই করত তাতেই বা কি আসে যায়। দ্রোহী ভালো করেই জানে যে বর্ষা আজকে ঢাকায়। রাতের বেলা ফোন করলে সেই ধরে। ইউনিভার্সিটিতে না গেল কিন্তু একটা ফোন করতে কি মান সম্মানে এতটা ঘাটতি পড়ে যায়? ইস ব্যক্তিত্ব। উনার ব্যক্তিত্ব আছে আর তার নেই? মেঘলা ভাবী বলেছিল রাত বারটার পর

ফোন করতে। দ্রোহীর ঘরে নাকি একটা রিসিভার আছে। থাকুকগে। করবে না সে, আর ফোন করবে না। কষ্টটা কি শুধু ওর একার? তার কষ্ট হচ্ছে না? হচ্ছে। ভীষণ কষ্ট। বুকের উপর একটা জগদ্দল হিমবাহ ভর করে আছে। কোন নড়াচড়া নেই। বছরে হয়ত আধা সেন্টিমিটার নড়বে।

মাথাটা ঘুরছে বর্ষার ভনভন সিলিং ফ্যানের সাথে পাল্লা দিয়ে। শরীরে কি জ্বর আছে? আছে হয়ত একশ দশ হবে। উঠে ফ্যানটা বন্ধ করা দরকার। থার্মোমিটারটা এনে জ্বরটা মাপা দরকার, এক আধটা প্যারাসিটামল ঘরে থাকলে খাওয়া দরকার, কমসে কম এক গ্লাশ পানি, গলাটা শুকিয়ে সাহারা। বাহ বুকে হিমবাহ, কণ্ঠে সাহারা। কি যেন একটা গান আছে না লতার,

মেরা নয়ন শ্রাবন ভাদর ফিরভি মেরা মন পিয়াসা।

গানটা পাল্টিয়ে তার এখন গাওয়া উচিত

মেরা বুকমে জগদ্দল হিমবাহ

ফিরভি আমার কণ্ঠ শুকনা।

হি হি হি। অভিমান করে লাভ নেই। অভিমানে কষ্ট হয়, জ্বলা বাড়ে। ভালোবাসায় কখনও আত্নসম্মানের কথা চিন্তা করলে হয় না। আরেকবার না হয় ফোন করাই যাক। ফোন করে কি বলবে সে দ্রোহীকে? কিছু বলবে না। শুধু শুধু চুপচাপ থাকবে। আর অন্য পক্ষ হ্যালো হ্যালো করবে। কি মজা।

X হ্যালো! হ্যালো! তারপর কিছুক্ষণ নীরবতা। অথবা অনেক্ষণ।

X হ্যালো বর্ষা আমি জানি তুমি ফোন করেছ। ফোন যখন করেছই কথা বলছ না কেন? নাকি পর পুরুষের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ?

X কি করে বুঝলেন যে আমি ফোন করেছি?

X তার উত্তরটা দেওয়া যাবেনা। কারণ উত্তরটা দিলে তুমি বিশ্বাস করবে না।

X আগে উত্তরটা দেনই, তারপর না হয় বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নটা আসুক।

X আমি যদি বলি তোমার নিঃশ্বাসের শব্দ আমাকে বলে দিয়েছে এটা কার নিঃশ্বাস, তাহলে কি বিশ্বাস করবে? কোন উত্তর দেয় না বর্ষা। শুধুই নীরবতা।

X চুপ থাকা সম্মতির লক্ষণ। অর্থাৎ তুমি বিশ্বাস করোনি। না কর। কিন্তু এটাই সত্য। আচ্ছা ঠিক আছে আরেকটা সত্য বলি শুনবে?

X শুনব

X কোন ছেলে যখন কোন মেয়েকে বলে যে তোমাকে ভালো লেগেছে তখন স্বভাবতই ধরে নিতে হয় যে মেয়েটার বাহ্যিক কোন সৌন্দর্য যেমন চোখ, ঠোঁট, বা চুল অথবা ইন্টারনাল অর্থাৎ আচার ব্যবহার, কথা বার্তা, যাকে বলে মন, সেই মনটাকে তার ভাল লেগেছে। আর আমার কাছে তোমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে কি জান?

X না বললে কি করে জানব?

X সবচেয়ে যে জিনিসটা ভালো লেগেছে তা হল তোমার নীরবতা। নীরবতা নিয়ে গ্রীক পুরাণে একটা সুন্দর গল্প আছে শুনবে?

X নাহ। গ্রীকদের কথা শুনতে ভালো লাগছে না। অন্য কথা বলেন।

X হঠাৎ এতরাতে ফোন করলে। তোমার বাবার বন্ধু কি নতুন কোন অভিযোগ দিয়েছে নাকি?

X দিতে পারে। আমি জানিনা। আপনি কি আমার ওপর রাগ করে আছেন?

X রাগ করার কোন কারণ আছে কি?

X প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন দিয়ে করেন ক্যানো শুধু?

X আচ্ছা ঠিক আছে আর করব না। এতটা রাত হলো ঘুমাওনি এখনও? সরি আবারও প্রশ্ন করে ফেললাম। আচ্ছা ধরে নাও এটা প্রশ্ন না জাস্ট আলাপচারিতা।

X ঘুম আসছে না। আপনি ভালো আছেন?

X এতক্ষণ পর তবুও জিজ্ঞেস করলে ভালো আছি কি না। হ্যাঁ, ভালো আছি। খুউব ভালো।

X আপনি আমাকে ক্ষমা করেন ঢ়ষবধংব. আসলে ------

X বাদ দাওতো। ওসব ক্ষমাটমা মহৎ মানবদের ব্যাপার। আমি মহৎ নই। তোমার কথাগুলো ক্যামন যেন অসলংগ্ন লাগছে।

X আমার ভীষণ জ্বর হয়েছে। বুকের ভেতর এক জগদ্দল পাথর, না না পাথর না হিমবাহ। নড়াচড়া নেই। উর্দ্ধে বছরে সিকি সেন্টিমিটার।

X ভালো জ্বর আসা ভালো। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। তা ওষুধ টষুধ কিছু খেয়েছো তো?

X না খাইনি। আমার কথা এখন থাক। আপনার কথা বলেন।

X আমার কি কথা শুনতে চাও তুমি?

X আমার খুব ভালো লাগার কোন ঘটনা, শৈশবের অথবা যে কোন সময়ের। অথবা গ্রীক পুরাণ অথবা আরব্য রজনী থেকে।

X বর্ষা তোমার শরীরটা মনে হয় বেশি খারাপ করেছে।

X না মোটেই না। আপনি বলেন। চষবধংব চুপ করে থাকবেন না। অপর প্রান্ত থেকে দ্রোহীর কণ্ঠ ভেসে আসে। শৈশবের কথা অথবা গ্রীক পুরাণ অথবা আরব্য রজনী নাকি অন্য কিছু। তুমি বলে যাও দ্রোহী। থেমো না। বল। যা কিছু ইচ্ছে তোমার বল। হিমবাহ, জ্বলন্ত সূর্য, আকাশ, কাকাতুয়া পাখি, বেলি ফুলের সুবাস, মাথা ব্যথা, যন্ত্রণা, কথা দেওয়া, ভালোলাগা, কথা না রাখা, আবার ভালোবাসা যন্ত্রণা, মথার ওপর ফ্যান, ভনভন, মঙ্গল গ্রহ, ভালোবাসা, ঘর, সুন্দর একটা ঘর, ঝড়, তছনছ, কপালে কোমল স্পর্শ, পানিপট্টি, মাথার ওপর ফ্যান, চারকোনা ঘর. দেয়ালের মোনালিসা, বনবন বন বন।

খুব ভোরে, তখনও মসজিদের মিনার থেকে আযানের মিষ্টি ধ্বনি বাতাসকে মুখরিত করেনি। কাকেরা তখনও সদলবলে কোরাস শুরু করেনি। তবে দু'একটা বয়ঃবৃদ্ধ কাক সকাল হওয়ার

আগেই ঘুম থেকে উঠে নিজেদের মধ্যে বাক্য বিনিময়ে ব্যস্ত। মুখটা তেতো বিস্বাদে ভরে আছে বর্ষার। মাথাটা অসম্ভব হালকা, শরীরে উত্তাপ নেই বললেই চলে। পাশ ফিরে শুতে গিয়ে টের পায় খাটে আরেক জনের অস্তিত্ব। মা ঘুমিয়ে আছে তার পাশে। মা আবার কখন আসল।

X কিরে ঘুম ভেঙ্গে গেল? শোয়া অবস্থাতেই মেয়ের কপালে হাত দিয়ে জ্বরের মাত্রা অনুভব করার প্রচেষ্টা চালায় জাহেদা।

X না। জ্বরটা এখন নেই। রাতের বেলা একশ তিন ছিল।

মায়ের বুকে মুখ লুকায় বর্ষা। নিঃশ্বাসে মা মা গন্ধ। তেতোর বিস্বাদ ভাবটা কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

X তুমি কখন আসলে মা?

X রাতে বাথরুমে যাচ্ছিলাম। তোর ঘর থেকে কথা আর হি হি - হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। এসে কপালে হাত দিয়ে দেখি গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। আজকে আর ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে কাজ নেই।

X আমার একটা পরীক্ষা আছে না যেয়ে উপায় নেই।

X বর্ষা।

X উম। মায়ের বুকে পূর্ববত মুখ লুকিয়ে জাহেদার ডাকের উত্তর দেয় বর্ষা।

X তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, সত্যি করে উত্তর দিবি ঠিক আছে?

X বল।

X দ্রোহী কি এখন ঢাকায়?

কোন উত্তর দেয় না বর্ষা।

X তোর সঙ্গে কি ও দেখা করেছে?

এবারেও কোন উত্তর নেই।

তোর ওপর তোর বাবার অনেক বিশ্বাস। অবশ্য তোর বোনের উপরও ছিল। সেই বিশ্বাস সে ভেঙ্গেছে। আর তাই আজকে আট বছর মেয়েটার মুখ সে নিজেও দেখে না আমাকেও --------।

X যার নিজের কোন নীতি নেই তার কি এতটা জেদ মানায়?

X ছি ছি মা, নিজের বাবা সম্পর্কে এরকম কথা বলতে নেই। তোর বাবা এই যে এতসব করেছে এগুলো কার জন্য? তোদের তিন জনের জন্য। তার মধ্যে একজন থেকেও নেই আরেক জন বিদেশে। কোনদিন শুনব বিদেশিনী বিয়ে করে ফেলেছে। আর তুইও যদি এমন কিছু করিস। কিরে কথা বলছিস না কেন? কই দেখি মুখ তোল। জোর করে মেয়ের মুখ তোলে জাহেদা।

দূর্বা ঘাষে ভোরের শিশিরের মত চক চক করে ওঠে বর্ষার দু'চোখ থেকে ঝরে পড়া নীরব রোদনের অশ্রুবিন্দু।

চমকে ওঠে জাহেদা। বিশ বছর ধরে যে মেয়েকে সে দেখে এসেছে, এখন সে নয়, অন্য কেউ। একরাতে একেবারে বদলে গ্যাছে মেয়েটা। প্রচণ্ড স্রোতস্বিনী নদীতে ডুবে যাওয়ার আগে যেমন খড়-কুটোকে আকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, জাহেদাও তেমনি তার মেয়েকে আঁকড়ে নিজের স্নেহময়ী বুকে টেনে নেয়। এ মেয়েটিই যে তার বেঁচে থাকার শেষ খড়কুটো।

॥ এগার ॥

তাল পাতার সেপাই শব্দটার সাথে দ্রোহীর কল্পনা পটে যে মানুষের ছবি ভেসে উঠত তার নাম আবুল কালাম আজাদ। চিকন চাকন টিং টিংয়ে। রেলিং ছাড়া ছাদ আর জোরে বাতাস এ দু'টোই ছিল কালাম ভাইর জন্য বিপ্বদজনক। কালাম ভাই দ্রোহীর বড় মামার ছেলে। বড় মামাকে কোন দিন দেখেনি দ্রোহী। প্রচুর বিষয় সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। ধনী পিতার একমাত্র সন্তান হলে যা হয়। অপদার্থের চরম সীমা। বাপের রেখে যাওয়া বিষয় সম্পত্তি যখন একেবারে যায় যায় দিন, তখনই অপদার্থ আবুল কালাম সর্ব প্রথম একটা পদার্থ জনিত কাজ করে। নারায়ণগঞ্জের এক ধনকুবেরের একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে পুরো রাজত্ব এবং সেই সাথে নাদুস-নুদুস শয্যাসঙ্গিনী নিশ্চিত করে আবুল কালাম আজাদ। আর্মানিটোলার ভগ্ন প্রায় পিতৃ নিবাস ত্যাগ করে নারায়ণগঞ্জে শ্বশুরের প্রাসাদ সম অট্টালিকায় নিজেকে ঘর জামাই হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ভবিষ্যৎ অগ্র যাত্রাকে তরান্বিত করার সকল প্রয়াসে লিপ্ত হয়। ড্রইং রুমে দ্রোহীর সামনে এই মূহুর্তে যে ভদ্রলোক বসে আছে তার সঙ্গে দশ বছর আগে সর্বশেষ দেখা। সেই তালপাতার সেপাই আজাদের সঙ্গে মিলের চাইতে অমিলের মাত্রা অনেক বেশী। কালাম ভাইকে দেখে দ্রোহীর মনে হচ্ছে সেই সাপ জ্যান্ত গোটা দুই আনত, একটু খেয়ে দেখি টাইপের কোন সর্বভুক মানব। তিন নাম্বার পরোটা শেষ করে চার নাম্বার পরোটার প্রথম খন্ডাংশে ঝোল আর পুরো একটুকরা গরুর মাংশ পেচিয়ে অজগর সাপের মত হা করে মুখে চালান দিয়ে নিজের আসন ত্যাগ করে দ্রোহীর পাশে এসে বসে আবুল কালাম।

X দ্রোহী তোকে একটা কথা বলি। প্রায় ফিসফিসিয়ে বিশেষ গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে দ্রোহীকে কিছু একটা বলতে চায় কালাম। কালামের কথার সাথে ঝোল মিশ্রিত থুথু দ্রোহীর গালে, মুখে, এদিক ওদিক লেপটে যায়। বা হাতে সেই ঝোল মিশ্রিত থুথু মুছে অধিক গোপনীয়তার ভঙ্গিতে দ্রোহী কালামের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে কি কালাম ভাই?

X ডলার কি পরিমাণ এসেছিল?

X কেন বলেনতো।

X দেশের মানুষ জন আর এখন মানুষ নেই। যার তার সাথে টাকা পয়সা লেনদেন, ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে ভুলেও পা বাড়াবি না। আরে বাংলাদেশের কোথায় টাকার গাছ আছে আমাকে জিজ্ঞেস কর।

X না না কিযে বলেন কালাম ভাই। আপনার সাথে এ ব্যাপারটা আলাপ করার জন্যই কাল পরশু আপনার ওখানে

যেতাম। তাছাড়া এই ভাবীর হাতের পায়েস। কলাও বেচা রথও দেখা বুঝলেন না।

X হে হে হে তা যা বলেছ।

শালা পাঁঠা বিয়ে করলে মানুষের মাথার বুদ্ধি পায়ে এসে ঠ্যাকে। আর বিয়ের পর ঘর জামাই হয়ে তোর বুদ্ধি একেবারে দেহত্যাগ করেছে। উজবুক জানি কোথাকার। মনে মনে বলে দ্রোহী।

X কি কালাম ভাই ওকে ব্যাপারটা বললেন? কাজে যাওয়ার জন্য একেবারে তৈরী হয়ে কালামের উল্টাদিকে বসতে বসতে প্রশ্ন করে ধ্রুব।

X হ্যাঁ হ্যাঁ সেই কথাই কেবল -- তা তুই যখন এসেছিস তুই-ই বল না।

X না না কালাম ভাই আপনিই বলেন।

X আচ্ছা ঠিক আছে। তা বলছিলাম কি দ্রোহী, আমার কাছে মানে তোর ভাবীর খোঁজে খুব ভাল একটা মেয়ে আছে। তোর ভাবীর বড় চাচার শালার মেয়ে। মেয়েটা দেখতে শুনতে মাশাল্লা তোর ভাবীর চেয়েও গায়ের রং পরিস্কার। সিলেট মেডিক্যাল কলেজ থেকে এবছর এম বি বি এস পাস করে বেরুল।

X বলেন কি তাহলে তো খুবই ভাল।

X হ্যাঁ তাহলে আর কি বলছি। দ্রোহীর আগ্রহ বুঝে আরও দ্বিগুণ উৎসাতে বলতে থাকে কালাম। মেয়ের বাপের সম্পত্তির ফিরিস্তি বংশ গৌরব এইসব। কন্যার পিতার এখন একটাই শর্ত যে দ্রোহীর সাথে ভদ্রলোক আগে একটু কথা বলবেন। ভদ্রলোকের মোহাম্মদ পুরের গার্মেন্টস কাম অফিসে আজ কাল বা যে কোন সময় দ্রোহীকে যেতে বারবার অনুরোধ জানাতে থাকে কালাম। অনেক ধনী লোক এমনকি মন্ত্রী-মিনিস্টারদের সঙ্গে পর্যন্ত উঠাবসা কালামের আছে। ইচ্ছা করলে আরও অনেক মেয়ের খোঁজ সে দিতে পারে। কিন্তু হাজার হলেও নিজের আপন মামাতো ভাই। যাকে সে জন্ম হতে দেখেছে, তার জন্য তো আর যেনো তেনো মেয়ের সম্পর্ক ঠিক করা যায় না।

আরও আধা ঘন্টার মত বকবক করে আবুল কালাম প্রস্থান করে বাদামতলীতে কোন পার্টির সঙ্গে দেখা করবে বলে।

কালাম চলে যাবার পর ধ্রুব মেঘলা আর সালমা বেগম দ্রোহীকে ঘিরে বসে গম্ভীর ভাবে। দ্রোহীর মতামত জানতে চায়।

X কি ভাবলি? ছোট ভাইকে প্রশ্ন করে ধ্রুব।

X এখানে ভাবাভাবির কি আছে। একটা মেয়েকে দেখলাম না শুনলাম না। এখনই এত ভাবাভাবির প্রশ্ন উঠছে কেন?

X তুই কি এখনও ঐ মেয়েটার আশায় আছিস?

কোন উত্তর দেন না দ্রোহী।

X চুপ করে না থেকে কথা বল ঢ়ষবধংব.

X যদি ঐ মেয়েটার আশায় থাকিই তাহলে অসুবিধাটা কোথায়?

X মা শোনেন আপনার ছেলের কথা শোনেন অসুবিধা কোথায় জিজ্ঞাস করছে।

X অসুবিধা আছে বাবা। মেয়েটার মা বাবা তোর কাছে মেয়ে দেবে না। কারণটা তারা জানে আর তুই সেই কারণের সত্য মিথ্যা জানিস। একবার কেউ যখন না করেছে তার কাছে আবার যাওয়া বা তার কাছে অনুনয় বিনয় করে বলা যে আমাদের ছেলে অতি সৎ চরিত্রবান, আপনারা বিশ্বাস করেন এসব কি তুই আমাদের করতে বলছিস?

X না তা বলছি না। আমার ব্যাপারটা আমিই দেখব।

X আচ্ছা ঠিক আছে তা দেখ। কিন্তু অভিভাবক হিসেবে আমাদের একটা দায় দায়িত্ব আছে। কাজেই ------

X ভাইয়া ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর। কালাম ভাইর মত একজন লোক বিয়ের ঘটকালি করছে।

X আহা এই মেয়েটাকেই যে বিয়ে করতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমাদের দেশে একটা সিস্টেম চালু আছে। একটা ছেড়ে দুটো মেয়ে দেখা, কথা বার্তা এসব আরকি। কোথাও না কোথাও কোন না কোন ভাবে শুরু তো করতে হবে।

ডযু হড়ঃ ঃঃধৎঃ রিঃয কালাম ভাই।

X কিন্তু ভদ্রলোকের মেয়েকে দেখলাম না তার আগেই সে আমার ইন্টারভিউ নিতে চাচ্ছে, এটা ঠিক আমি মেনে নিতে পারছি না।

X ইস্। আঁতে ঘা লাগল না? এতক্ষণ চুপচাপ ছিল মেঘলা। এবারে সে ফোড়ন কাটে।

যখন একটা মেয়েকে ছেলের পক্ষ দেখতে যায়, সামনে বসিয়ে একের পর এক জেরা করতে থাকে তখন ঐ মেয়েটার ক্যামন লাগে ভেবেছিস কখনও?

X ওরে বাপরে বাপ, এযে একেবারে তসলিমা নাসরিনের ফুপাতো বোন। আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করব। অলরাইট? সভা আজকের মত এখানেই মূলতবী ঘোষণা করা হোক। আমাকে একটু বেরুতে হবে।

রাস্তায় বেরিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে শুরু করল দ্রোহী। এই মুহূর্তে তিনটা জরুরী কাজের তালিকা তার সামনে অদৃশ্য দন্ডায়মান। প্রথমতঃ নাহারের খোঁজ নেওয়া, দ্বিতীয়তঃ হাবিবের সঙ্গে যোগাযোগ, আর তৃতীয়ঃ এবং শেষ পর্যন্ত বর্ষার সঙ্গে দেখা করা। প্রথম কাজ দুটো জরুরী হলেও সিডিউলে উল্টাপাল্টা করা যায় অথবা বিকল্প কোন ব্যবস্থাও নেওয়া যায়। কিন্তু শেষেরটা? পালাবার পথ নেই, ফাঁকি দেবার কোন উপায় নেই। পুরো একটা সপ্তাহ কেটে গেছে। এই পুরো সপ্তাহটা কি সে জীবিত ছিল? ছিল না। শ্বাস নিয়েছে ঠিক, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র তার নেটওয়ার্কের ওপর খবরদারি করেছে ঠিক, শরীরের পেশীগুলো নড়াচড়া করেছে ঠিক। জীব বিজ্ঞানের আভিধানিক অর্থে সে জীবিত ছিল কিন্তু সবসময় বিজ্ঞানের যুক্তি বা প্রযুক্তি কাজে খাটে না। দ্রোহীর ক্ষেত্রে যেমন খাটেনি। হলফ করে বলতে পারে এই এক সপ্তাহ সে জীবিত ছিল না।

ঢাকা শহরে যাতায়াত ব্যবস্থায় একটা আমূল পরিবর্তন আসা অবধি লক্ষ্য করেছে দ্রোহী। বি আর টি সি বাস সহ আরও বেশ

কয়েকটি কোম্পানি লোকাল বাস সার্ভিসে রীতিমত বিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। নন স্টপ গেইট লক, বা আল্লার কসম গেইট লক এধরণের কিছু লেখা নেই। বিভিন্ন স্থানে নিজস্ব টোল ঘর আছে। যাত্রীরা টিকেট কেটে লাইন ধরে দাঁড়ায়। বাস আসার পর প্রথমে গন্তব্যে আসা যাত্রীরা নামে, তারপর খালি আসন অনুসারে যাত্রী ওঠে। দরজা বন্ধ, সা সা পরবর্তি গন্তব্য। গুলিস্তান থেকে ধামরাই যেতেও এই ধরণের একটা বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। টিকেটের দাম একটু বেশী, তবে ডলারে কনভার্ট করলে এক ডলারেরও কম। নট ব্যাড।

ফার্মগেট, আসাদ গেইট, গাবতলী আর সাভারের ট্রাফিক জ্যাম পেরিয়ে যখন দ্রোহী জাহাঙ্গীরনগর পৌঁছে তখন সূর্য রীতিমত একদিকে কাত হয়ে গ্যাছে।

ক্লাশ থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু তন্দ্রা এসেছিল বর্ষার। এমন সময় ডাক আসে ভিজিটর এসেছে। কে হতে পারে। বাসার কেউ হবে না কারণ আজকেই মাত্র সে ঢাকা থেকে আসল। ক্লাশ মেটরা কেউ? নাহ সম্ভাবনা নেই। তবে কি --- মেঘলা দিনে লুকোচুরিরত সূর্যের মত ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা, বর্ষার মেঘলা মনের আকাশে এক পলকের জন্য উকি দেয়। একবারই মাত্র। দ্রোহী আসবে না। কোনদিন আসবে না।

প্রথমে দ্রোহীকে দেখে থমকে যায় বর্ষা। এক মুহূর্তই মাত্র। তারপর শরীরের রক্ত কনা দ্রুত লয়ে সঞ্চালিত হতে থাকে। অণু পরমাণু, কোষ কলাগুলি এক অপূর্ব আনন্দে পুলকিত হতে থাকে। এবং টের পায় বর্ষা সে কাঁপছে। বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত এক সাগর নোনা জল তেড়ে আসছে সো সো করে। যে কোন সময় প্লাবিত করে দিতে পারে নিকটবর্তী তীর, উপকুল। অবাধ প্লাবনকে অনেক কষ্টে দমন করে বর্ষা। বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে

X ক্যামন আছেন?

X ভাল। ডযধঃং ঁঢ়?

X ইংরেজী বলবেন না। ইংরেজীটা বুঝি কম। আচ্ছা ঠিক আছে বলব না।

X কিছুক্ষণ বসবেন তো?

X তুমি যদি বসতে বল।

X কোথায় বসবেন?

X সেই জায়গায়। দীঘির পাড়ে পানিতে লাল পদ্ম, গাছের নীচে সিমেন্টের দুটি পিঁড়ি, হাঁটু সমান উঁচু, পাশাপাশি।

এক অপূর্ব মোহিনী ভঙ্গিতে হাসে বর্ষা। নাহারের মত বর্ষার লক্ষীদাঁত নেই। হাসলে গালে টোল পড়ে না। টোল পড়া ছাড়া বা লক্ষী দাঁত ছাড়াও হাসি সুন্দর হয়। ভীষণ সুন্দর হয়। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকতে হয়, সেই হাসি যে হাসে সেই সুহাসিনীর দিকে। বলতে মন চায়, সুহাসিনী তুমি হাসতে থাক। আমি সেই হাসি শুনব এবং দেখব। এখন, পরে, আরও পরে, হাজার বছর ধরে, কাছে থেকে, দূর থেকে, লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে।

ভেতরের অবাধ্য প্লাবনটা বার বার বাঁধ ভাঙ্গতে চাইছে। আর বেশিক্ষণ হয়ত আটকে রাখা যাবে না।

X আমাকে যে পাঁচ মিনিট সময় দিতে হবে। মাইন্ড করলেন?

X হ্যাঁ করলাম। হা হা হা। যাও তো তুমি।

ঘরে এসে বিছানায় উপর হয়ে প্লাবণটাকে বের হতে সুযোগ দেয় বর্ষা। কান্না থামলে হাতমুখ ধুয়ে পরিপাটি হয়ে আবার সিঁড়িতে পা রাখে। নিজেকে অনেক হালকা আর উৎফুল্ল মনে হচ্ছে বর্ষার।

X কি এত দিন পর মনে পড়ল? আমার সবংংধমব পেয়েছিলেন?

X গবংংধমব পেয়েই তো পড়িমরি করে ছুটে এসেছি।

X ফোন না করলে বুঝি আসতেন না? সত্যি করে বলবেন আমাকে খুশি করার জন্য না।

X সত্য কথা বললে তুমি সত্যিই খুশি হবে না। ভীষণ কষ্ট পাবে।

X আমি এত অল্পতে কষ্ট পাইনা। আপনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন।

X আসতাম। তুমি না করলেও আসতাম।

মাথা নীচু করে থাকে বর্ষা। আনন্দ বা দুঃখ কোনটারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে না তাতে।

X বলেছিনা খুশি হতে পারবে না আমার কথা শুনে।

X তাহলে এতদিন আসেননি কেন?

X ব্যস্ত ছিলাম। ভীষণ ব্যস্ত। মেয়ে দেখা ব্যস্ততা যাকে বলে।

X মেয়ে দেখা ব্যস্ততা মানে? আপনি মেয়ে দেখেছেন?

X দেখব না কেন। আমাকে তো বিয়ে করতে হবে নাকি?

X তাতো ঠিকই। তা কটা মেয়ে দেখলেন?

X দু'টো। প্রথম জনের চেহারা সুরত মোটামুটি। মেয়ের বাবা উপমন্ত্রী, পশু বিষয়ক।

X আর দ্বিতীয় জনের?

X দ্বিতীয় জনের চেহারা অতি চমৎকার। মেয়ে এম বি বি এস ডাক্তার, বাবার বিশাল গার্মেন্টস। সব কিছুই একেবারে যুৎসই। সেকেন্ডটাই হয়ত করব ভাবছি।

X ভাল। দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে বর্ষা এবং তারপর নীরবতা।

X আমাকে বিয়েতে যেতে বলবেন না?

X অবশ্যই। তুমি থাকবে বিয়েতে চীপ গেষ্ট, সংসদের চীপ হুইপের মত।

X আপনার বউর সঙ্গে কি বলে পরিচয় করিয়ে দেবেন?

X বলব আমার এক্স প্রেমিকা। আর দশটা মেয়ের মতই। কথা দিয়ে কথা রাখেনি।

X আমি ভেবেছিলাম আমার ওপর আপনার রাগ নেই।

X তোমার ওপর আমার কোন রাগ কখনই ছিল না। আর যদি বা থাকতই তাহলে সেই রাগ প্রসমনের কোন কারণ ঘটেছে কি?

আবার সেই মোহিনী ভঙ্গিতে হাসি। অপলক তাকিয়ে থাকে দ্রোহী। এই মেয়েটা ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতে পারেনা সে। আনমনে দীঘির টলটলে পানিতে ঢিল ছোড়ে বর্ষা। কি বলবে বুঝতে পারে না সে। কালকে রাতে মনে মনে যা ভেবেছে তা যদি এখন বলতে পারত।

X তোমার গড়স আর উধফ ক্যামন আছেন?

কোন উত্তর দেয় না বর্ষা।

X চুপ কেন? এই নীরবতা নিয়ে গ্রীক পুরানে একটা গল্প আছে শুনবে?

X নাহ। এক গল্প বারবার শুনতে ভাল লাগে না। অন্য কথা বলেন। কাহিনী না। বাস্তব কিছু।

X আচ্ছা তাহলে বাস্তবই শোন। আমার অনেক ইচ্ছা ছিল এমন একটা মেয়েকে জীবন সঙ্গিনী করব যে সত্যিকারে আমার অর্ধাঙ্গিনী হতে পারে। টিপিকাল বউ না। একটু উদার মনের, ঘবাবৎ গরহফ টাইপের। আর যখন বিয়ে করব তখন একবার, একজনকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে দেখব বা পছন্দ করতে যাব। সকাল বিকেল মেয়ে দেখব, জড়ভরত হয়ে সেজেগুজে মেয়েরা আমার বা আমার অভিভাবকের সামনে বসবে, আর একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাবে ভাইবা বোর্ডের মত, সে রকমটা আমার ক্ষেত্রে কখনও হবে না। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে যা মনে হচ্ছে তাতে আমাকে আমার নীতি থেকে সরে আসতে হবে। আমি ঠিক করেছি মেয়ে দেখায় সেঞ্চুরী করব। কাজটা যেহেতু অন্যায় সেহেতু সেই অন্যায়ের ভাগীদার হিসেবে আমি একজনকে নমিনি করে রেখেছি। কম্প্রেন্দে?

X শেষের শব্দটা বুঝলাম না।

X কম্প্রেন্দে মানে বুঝেছ? ঝঢ়ধহরংয.

X আমার সামনে ঝঢ়ধহরংয বলবেন না। বুঝি কম।

আচ্ছা ঠিক হ্যায় বলব না।

মিষ্টি করে হাসে বর্ষা দ্রোহীর স্বভাব সুলভ দুষ্টুমিতে।

X তা এই আপনার বাস্তব কথা?

X না আরও আছে।

X থাক আর বলতে হবে না। এবারে আমার কথা শোনেন।

X বল।

X আপনার যেমন কিছু নীতি আছে আমারও তেমনি কিছু নীতি আছে। কিছু কিছু জিনিস জীবনে করব না বলে আমি পণ করেছিলাম। মা বাবার অমতে বিয়ে করাটা ঐ রকম না'র তালিকায় আছে। এর পেছনে বেশ কিছু কারণও আছে। বলতে পারেন, পরিবারের বিভিন্ন ঘটনার কারণে আমি এ ধরণের পণ করেছি। আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা করেন ঢ়ষবধংব.

X সিনোরিতা, আমি জানিনা কেন তুমি এধরণের পণ করেছ কিন্তু তোমার এই নীতির জন্য যে আরেক জনের জীবন---- যাক বাদ দাও।

হায়রে হায় হৃদয় দিয়েছি
তোমার মত এক হৃদয়হীনার কাছে। হো হো হো।

X কালকে রাতে তোমাকে স্বপ্ন দেখলাম।

X কি দেখলেন?

X দেখলাম তোমার ভীষণ জ্বর বিছানায় এপাশ ওপাশ করছ। ডাক্তার ডাকা হয়েছে। ডাক্তার আসল। ডাক্তারটা আর কেউ না আমি। হাতে রেগুলার ডাক্তারি ব্যাগ না কলেজ ছাত্রের মত বইয়ের ব্যাগ কাঁধে ঝোলানো। তোমার পাশে বসলাম। হাতটা নিলাম পালস দেখার জন্য। এক মিনিট দুই মিনিট আমি তোমার হাত ধরে আছি। হঠাৎ তোমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমাকে অপলক তাকিয়ে থাকতে দেখে তুমি বললে ওমন করে কি দেখছেন?

আমি কোন উত্তর দেয়ার আগেই কোথা থেকে একজন বিবেক এসে হাজির।

X বিবেক মানে?

X যাত্রার বিবেক। হাতে একতারা বা দোতারা না গীটার। লোকটা ভোলামন না বলে নেচে নেচে হিন্দি গান গাইতে লাগল। তুঝে দেখা তো এ জানা সনম।

মুখে ওড়না চাপা দিয়ে হাসছে বর্ষা। তার পর?

তারপর আচমকা ইয়া বড় গোঁফ, কুচকুচে কালো ভুড়িওয়ালা, খালি গায়ে এক লোক বিরাট এক তরবারি নিয়ে আমাকে কোঁপ দিতে উদ্যত হল। ঠিক তখনই তুমি চিৎকার করে বললে বাবা ওকে মেরো না। ব্যাস ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

এতক্ষণ হাসছিল বর্ষা। শেষের কথায় ফাটা বেলুনের মত চুপসে যায়।

X আমাকে এখন উঠতে হবে। কালকে ক্লাশ টেষ্ট আছে।

X ঠিক আছে তাহলে আসি এখন। বলেই উঠে দাঁড়ায় দ্রোহী।

এ ক্যামন মানুষ। একটু রাগ হয়েছে বলে এই কথাটা বলেছিল বর্ষা। এতটুকুও বোঝে না দ্রোহী। দ্রোহী তো এখন বলতে পারত রাখতো তোমার পরীক্ষা। আজকে পূর্ণিমা। একটু পরেই চাঁদ উঠবে। ইয়া বড় থালার মত রুপালী চাঁদ। আমরা দুজনে মিলে চাঁদ দেখব। চাঁদ নিয়ে গ্রীক পূরানে একটা গল্প আছে -----। মনে মনে কাতর অনুরোধ জানায় বর্ষা ঢ়ষবধংব যাবে না। আরেকটু বসে যান।

বর্ষার মনের কথা পড়তে পারেনা দ্রোহী।

X কই চল তোমার হলের সামনে থেকে রিক্সা নেব।

দ্রোহী চলে যাবার পর হলের গেটে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে বর্ষা। শীত শীত লাগছে। আবার বুঝি জ্বরটা আসল। হাত ঘড়ির দিকে তাকায় বর্ষা। ইউনিভার্সিটির শেষ বাস এখনও ছাড়েনি। দ্রুত বাসার দিকে হাঁটতে থাকে সে।

অনেক রাতে বাড়ি ফেরে দ্রোহী। দরজা খোলে মেঘলা।

X কি ব্যাপার মুখটা মলিন কেন?

X খুব খরাপ একটা সংবাদ আছে। উত্তর দেয় মেঘলা।

হার্টবিট বেড়ে যায় দ্রোহীর।

X কি বলতো।

X ফেরদৌস চাচার লিভারে ক্যান্সার ধরা পড়েছে।

হঠাৎ করেই শরীরের সমস্ত শক্তি লোপ পায় দ্রোহীর।

রক্ত প্রবাহে হিম শীতল একটা স্রোত বয়ে যায়। মৃত্যুর হিম শীতল স্রোত।

X তোর ঘরে হয়ত শুয়ে আছে।

এক পা দু পা করে ওপরে উঠে আসে দ্রোহী। পর্দা সরাতেই দেখতে পায় একটা জীবন্ত কংকাল শুয়ে আছে বিছানায়। হাড়গুলো এক দুই করে গোনা যাবে। নিশ্বাসের তালে তালে বুকের পাঁজরের হাড়গুলো কামার শালার হাপরের মত উঠা নামা করছে। ঘুমাচ্ছে ফেরদৌস চাচা। সামনে সীমাহীন যাত্রা। বিশ্রাম নিচ্ছে তাই বেচারা। থাক বিশ্রাম নিক। দরজা থেকেই ফেরত যায় দ্রোহী। ছাদে উঠে একা একা পায়চারী করতে থাকে। মাথার ওপর এক থালা রুপালী চাঁদ। সমস্ত আকাশ জুড়ে অগণিত নক্ষত্রের অগ্নি উৎসব। ছাদ সমান উঁচু নারিকেল গাছের ছিপছিপে পাতায় প্রতিফলিত হয়ে আসা সিরসিরে বাতাস। পৃথিবীটা খুব সুন্দর। এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে কেই বা যেতে চায়।

॥ বার ॥

সুন্দরী রমনীর বিরল চাহনী অথবা সুনজর পাবার আশায় তার উপকার করা আর জাতি সাপের লেজ দিয়ে কান চুলকানো সমান কথা। এরশাদের আমলে কত বোমা বানিয়েছে হাবিব। নির্দিষ্ট স্পটে গিয়ে কতবার বোম মেরেও এসেছে, কোমরে পিস্তল নিয়ে পুলিশের নাকের ডগায় এদিক ওদিক কত ঝামেলা করেছে। কিন্তু কোন দিন শরীরে কাঁপুনি তো দূরের কথা ঝাকুনিই দেয়নি। আর কাল থেকে রীতিমত কাঁপুনি এসে আছে শরীরে। কাল মোহাম্মদপুর কাজী অফিস থেকে নাহারকে নিয়ে নামিয়ে দেবার কথা বনানীতে। নামিয়ে সে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু বিপত্তি বাধিয়েছে নাহারের স্বর্ণালংকার ভরা সুটকেসটা। এই সময় মা-বাবার সামনে দিয়ে সুটকেস নিজের ঘরে ঢুকালে ধরা পড়ে যেত সে। নাহারের তখনকার অবস্থা ছিল যুদ্ধে পরাজিত এবং প্রতিপক্ষের হাতে বন্দি সৈন্যের মত। সেই প্রতিপক্ষটা যেন ছিল হাবিব। আমাকে প্রাণে মারবেন না দোহাই আপনার। অনেকটা সেই ধরণের ভঙ্গি ছিল নাহারের মধ্যে।

X করহফষু সুটকেসটা কি আপনার কাছে রাখবেন? আজকে রাতের মত ।

X জ্বী মানে ইয়ে।

X প্লী ই জ ।

কি আর করার। নাহারের মত সুন্দরী কোন মেয়ের কাছ থেকে প্লীজ নামক বিনয়াবনত শব্দটি শোনা আর লটারীতে এক কোটি টাকা পাওয়া সমান কথা। লটারীতে এক কোটি টাকা পাইলে তুমি কি করবা? পাইলে নয় রীতিমত পাইয়া গিয়াছে হাবিব। এখন কি করবে ভেবে পায়না। হাবিবকে কোন রকম কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে যায় নাহার।

X কালকে সকাল দশটায় আসাদগেইটে জাপানীজ রেটুরেন্টের সামনে আসবেন ঠিক আছে? দেরি না করে হন হন করে প্রাসাদের দিকে হেটে যায় নাহার।

সারারাত ঘুম হয়না হাবিবের। কি জানি বাবা, বড়লোকের খেয়ালি মেয়ে। রাতেই হয়ত হৈ চৈ পড়ে গেল, সিন্ধুকের গয়নাগাটি, টাকা পয়সা লাপাত্তা। নিজের চামড়া বাঁচানোর জন্য হয়তবা হাবিবের নাম বলে দিল। অথবা কালকে সকালে সময় মত যেতে পারল না হাবিব। ব্যাস হুলিয়া। তৎপর পুলিশ। গ্রেফতার। অভিযোগ চুরির। গরীবের মান সম্মানটাই আছে। তা গেলে আর থাকে কি।

অথবা রাতেই বাড়িতে ডাকাত পড়ল। মাথা ফাটালেও সে বিশ্বাস করাতে পারবে না যে এটা সত্যিই ডাকাতি, সাজানো না।

কাঠি ভেবে যা দিয়ে কান খোচাচ্ছে সে, তা হয়ত আদৌ কাঠি না, জাতি সাপের লেজ। বিপদ জনক জিনিস।

ঘুম থেকে উঠতে উঠতে সাড়ে নয়টা বেজে যায়। ঝড়ের বেগে তৈরী হয়ে যখন আসাদগেটে পৌঁছে হাবিব, তখন সাড়ে দশটা বেজে গ্যাছে। রেষ্টুরেন্ট বন্ধ। বন্ধ রেষ্টুরেন্টের সামনে নাহার দাঁড়িয়ে আছে। পরনে বেগুনি রঙ্গের সালোয়ার কামিজ। রং হিসেবে বেগুনি রংটা হাবিবের পছন্দের তালিকায় দশ নম্বর। কিন্তু এক মুহূর্তে তরতর করে দশ নম্বর রংটা এক নম্বরে এসে গেল। বেগুনী পরীর মত লাগছে মেয়েটাকে।

X সরি দেরি হয়ে গেল।

X না দেরি হয়নি আমিও এই মাত্র এসেছি।

X চলেন এই রেষ্টুরেন্টটা বন্ধ। অন্য কোথাও গিয়ে বসি। প্রতিবাদ করতে পারে না হাবিব। মিরপুর রোডের ওপর রিমঝিম ক্যাফে নামের একটা রেষ্টুরেন্টে বসে ওরা দুজনে। হাবিবের চোখে মুখে স্পষ্ট ভীতির ছাপ। সামনের টেবিলের দুই তৃতীয়াংশ অতিক্রম করে নাহারের দিকে ঝুঁকে হাবিব বলে

X ম্যাডাম, জিনিসটা নেবেন কখন?

ঠিক যেন ককটেলের, অস্ত্রের অথবা গাঁজা কোকেনের চালান নিয়ে কথা বলছে হাবিব। কাকপক্ষী টের পেলে মুশকিল।

সামান্য হাসে নাহার। লক্ষ্মী দাঁত বের করা দুষ্টুমির হাসি।

X আপনি এমন নার্ভাস হচ্ছেন কেন? ঐ সুটকেসে তেমন কিছু নেই। আমার জামাকাপড় আর সাজগুজ করার জিনিষ। হি হি হি। আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আপনার কাছে ফেন্সিডিলের চালান রাখতে দিয়েছি। শোনেন সুটকেসটা আমি এখন নিতে পারছি না। ওটা আপনার কাছেই থাক।

X দেখেন ম্যাডাম।

X আমাকে ম্যাডাম বলবেন না তো। আমি কি বিরোধী দলের নেত্রী নাকি?

X আচ্ছা ঠিক আছে আর বলব না ম্যাডাম। কিন্তু দয়া করে গরীবকে ফ্যাসাদে ফেলবেন না। সুটকেসটার দায়িত্ব বুঝে নিলে আমি যেতে পারি। দ্রোহী হয়ত এতক্ষণ আমাকে না আসতে দেখে অস্থির হয়ে আছে।

X আচ্ছা আপনার মধ্যে সবসময় ঐড়ঁৎ ঐড়হড়ৎ, ঐবৎ, হাজির আছি এধরণের বিনয়ে বিগলিত ভাব থাকে কেন? আপনি দ্রোহী ভাইর কেনা গোলাম না যে সময়মত হাজির হতে হবে সব সময়। সে আপনার বন্ধু। বন্ধু বন্ধু একেবারে সমান সমান না হলেও উনিশ বিশ পার্থক্য থাকা উচিত। কিন্তু আপনার আর দ্রোহী ভাইর মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে উনিশ আর এক হাজার উনিশ। কি ভুল বললাম?

X ব্যাপারটা নিয়ে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে।

X অপমান করতে চাইছেন? কিন্তু আমার এত অল্পতে অপমান হয় না। জানেন আপনার জন্য আমার মায়া হচ্ছে। পুরুষ মানুষ, কিন্তু মেরুদন্ডহীন। হি হি হি।

X আমার জন্য আপনার মায়া হচ্ছে? মায়াতো হবার কথা আপনার জন্য আমার। আপনার ইদ্রিস, থুড়ি ইদ্রিস না সিদ্দিকের খবর কি?

X আমি তো বলেছি অল্পতে আমি অপমানিত হইনা। সিদ্দিক আমেরিকায় ডি ভি পাওয়া এক মেয়ের সঙ্গে ঝুলে পড়েছে। খুব শিগগির বিয়ে করে আমেরিকা যাচ্ছে। নিজের ভাল কে না বোঝে। আমাকে বিয়ে করলে সুন্দরী একটা বউই শুধু পেত। আর তার সাথে পুলিশ ঝামেলা, মামলা, হামলা, চাইকি খুনও হয়ে যেতে পারত। আমার মা আর বাবা দুজনেই ঘুঘু শ্রেণীর মানুষ। প্রয়োজনে খুন খারাবিও করাতে পারে। সে যাই হোক সিদ্দিক এখন অতীত। কিন্তু দ্রোহী ভাইর প্রতি আপনার মনিব ভৃত্য ভাব দেখে আমি খানিকটা কিউরিয়াস।

X ঙরষ‍ুড়ঁৎ ড়হি সধৎংযরহব গধফধস.

X তেল দেওয়া যার অভ্যাস সে নিজের চরকা না পরের চরকা তা ভাবে না চরকা পেলেই তেল দেয়। হাবিব সাহেব আমাকে লাঞ্চ করাবেন?

X আপনাকে লাঞ্চ করানোর মত পয়সা আমার নেই।

X কোই বাত নেহি। আমিই না হয় পয়সা দিলাম।

X কিন্তু দ্রোহী আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

X উনার হাত পা আছে, দুই চোখ আছে, এই ঢাকা শহরেই বড় হয়েছে, আমেরিকার মত দেশে দশ বছর থেকে এসেছে। আর সেই কিনা আপনাকে ছাড়া একদিন চলতে পারবে না। এ ক'দিন তো বন্ধুর সঙ্গে কাটালেন, ভবিষ্যতেও কাটাবেন। আজকের দিনটা না হয় আমার সঙ্গেই কাটালেন। একবার ভাবুন তো আমি সুন্দরী, স্মার্ট, ধনীর কন্যা এবং শিক্ষিতা। এরকম একটা মেয়ে যেচে আপনাকে লাঞ্চ খাওয়াবে বলছে। আপনি বার বার বাইন মাছের মত পিছলে যাবার চেষ্টা করছেন আর সেই মেয়েটা ছাই দিয়ে ধরতে চাইছে কিন্তু পারছে না। সিনেমা উপন্যাসে এরকমটা হয়। বাস্তবে হয় না বললেই চলে। এখন আপনি কি চাচ্ছেন যে সিনেমার নায়িকার মত ধেই ধেই করে নেচে প্রেম নিবেদনের গান গাই? তাতেও আমার আপত্তি নেই, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সখী অর্থাৎ কলসী কাকে এক্সট্রা নেই। সাবিনা ইয়াসমিন অথবা রুনা লায়লা নেই, কণ্ঠ দেবে কে?

X হো হো হো। অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে হাবিব। আস্তে আস্তে জাতি সাপ আর কাঠি ঘটিত সমস্যা কেটে যাচ্ছে।

X কিন্তু ম্যাডাম দ্রোহী -----

X ব্যাপারটা কি আমাকে একটু বলবেন?

X ব্যাপার কি মানে?

X দ্রোহীর সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা। অবশ্য এখানে শুনব না। হাইওয়ে ধরে কোথাও চলেন যাই। অনেক দূর। যাব আর আপনাদের কথা শুনব।

ঢাকা চিটাগাং হাইওয়ে ধরে ছুটে চলছে হাবিবের ট্যাক্সি। নাহারের স্যাম্পু করা অবাধ্য চুল, দুষ্ট বাতাস, সুগন্ধ, লক্ষ্মী দাঁত, মিষ্টি হাসি। এমন যাত্রী তার ট্যাক্সি জীবনে পায়নি, পাবেও না কোনদিন হাবিব।

X তারপর বলেন এ দোস্তি কা কাহানী। হিন্দি গানের সুরে প্রশ্ন করে নাহার।

X তাহলে শোনেন। বলতে শুরু করে হাবিব।

আমি যখন ক্লাশ এইটে পড়ি তখন হঠাৎ করেই - আমার বাবা মারা যান। খুব নীচু পদের একটা সরকারি চাকুরী করতেন আমার বাবা। অফিস থেকে যে টাকা পওয়ার কথা তা আটকা পড়ে যায় কোন এক টেবিলে, কয়েক হাজার ফাইলের নীচে। আমার মা মামাদের কাছ থেকে, এদিক ওদিক করে সংসার চালাতে থাকল। একটা ছোট বোনও ছিল। ছিল বলতে এখনও আছে, বিয়ে হয়ে গ্যাছে। আমরা থাকতাম লক্ষ্মী বাজারে এক কামরার একটা বাসায়। প্রায় প্রতিদিন সকালে না খেয়ে আমি আর আমার বোন স্কুলে যেতাম। সবদিন কষ্ট হত না তবে যেদিন পি টি ক্লাশ থাকত সেদিন খুব কষ্ট হত। দ্রোহী আর আমি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। প্রতিদিনই স্কুল শেষে একসাথে পড়াশোনার নাম করে ওদের বাড়ি যেতাম। একসাথে পড়ালেখাটা বড় কথা ছিল না, বড় কথা ছিল পেটভরে ভাত খাওয়া। ওদের অবস্থাও আহামরি কিছু না, কিন্তু তারপরও আমাদের চাইতে অনেক অনেক ভাল। অন্তত না খেয়ে থাকার মত অবস্থা ছিল না। কোন রকমে মেট্রিক পরীক্ষা হয়ে গেল। পরীক্ষার আগে নতুন কলম, হলে যাতায়াতের রিক্সা ভাড়া, টিফিন মোটামুটি সব কিছুই ওর বদৌলতে চলত। এক পর্যায়ে লক্ষ্মী বাজারে থাকা মুশকিল হয়ে গেল। মিরপুরে একটা বস্তির মত ঘরে চলে আসলাম। মা সেলাই চেলাই করে সংসার চালাতো। এর মধ্যে বোনটাও বড় হয়েছে। রাস্তা ঘাটে চলতে

গেলে বখাটে ছেলেরা সিটি বাজায়, একথা ও কথা বলে। একদিন এক বখাটে ছেলের সঙ্গে মারামারি করলাম। বলা যায় সেই সূত্রপাত। এলাকার কমিশনারের নজরে পড়ে গেলাম। দু'চার পয়সা আসতে থাকল এদিক ওদিক থেকে। কলেজেও যাই তবে নাম মত্রে। স্কুল বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ একরকম বন্ধ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে দ্রোহীর সঙ্গে দেখা হতো, কিন্তু ও ঐ সময়টা আমাকে ধাড়রফ করতে চাইত। রংবাজী, গুন্ডামী, ছ্যাচড়ামি গোড়া থেকেই অপছন্দ করত দ্রোহী। ধীরে ধীরে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকল। সরকারি দল, বিরোধী দল সবখান থেকেই টুকিটাকি বায়না পাই। বোমা তৈরী করা, ফাটানো। পানের দোকান থেকে শুরু করে স্বর্ণের দোকান পর্যন্ত সব জায়গাতেই চাঁদাবাজী করেছি। খালেদার আমলে বা আজকের সরকারের আমলের অনেক এমপি, মন্ত্রীদের ঐ সময় খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে। ইউনিভার্সিটির হল থেকে দু-একবার ধরাও খেয়েছি। সাত দিন, পনের দিন জেল খেটে আবার বেরিয়ে যা তাই। এর মধ্যে বোনটার বিয়ে হয়ে গেল। স্বামী ডাক্তার। বর্তমানে দাউদকান্দিতে পোষ্টিং। সে যাইহোক এসব অপকর্ম করলেও খুব একটা লাইম লাইটে আসা বা নিজেকে এক্সপোজ করা পারত পক্ষে এড়িয়ে যেতাম। বি এন পি ক্ষমতায় আসার পর মেয়র ইলেকশনের সময় এ্যারেস্ট হলাম। অস্ত্র মামলায়। প্রায় বছর খানেক জেলে ছিলাম। এর মধ্যে মা টা গেল মারা। সৌভাগ্যক্রমে এক বছর এর মাথায় ছাড়া পেলাম, সরকারি দল করতে হবে বলে খত দিয়ে। জেলের এক বছরে আমার ভেতরে পরিবর্তন এসে যায়। তাই জেল থেকে বেরিয়ে একেবারে চুপ মেরে যাই। ছোট বোনের আশ্রয়ে থাকতাম আর কিছু করার চেষ্টা করতাম। ঘটনাক্রমে দ্রোহীর ঠিকানাটা পেয়ে যাই। ওর সাথে যোগাযোগ করি। বন্ধু আমার, আমাকে আশার বাণী শোনায়, অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। এই যে আজকে ট্যাক্সি চালাচ্ছি এর শত ভাগ কৃতিত্ব দ্রোহীর। আর মাত্র একবছর কিস্তি চালিয়ে যেতে পারলেই এই গাড়ীটা আমার হয়ে যাবে। ওপর ওয়ালার দয়ায় বেঁচে আছি। আমার মত কত হাবিব এক বুলেটে ফুটুস। দ্রোহীর ঋণ এখনও শোধ করতে পারিনি। অবশ্যি এই ঋণ কোনদিন শোধ করবার না।

X সরি। হাবিব সাহেব, না জেনে আপনাকে আঘাত করাটা আমার উচিত হয়নি। চলেন না আপনার বোনের বাসা থেকে ঘুরে আসি।

X হ্যাঁ, আপনি না বললেও আমি যেতাম। অনেক দিন হয় বোনটাকে দেখিনা।

॥ তের ॥

চুল কেটে মহাবিপদে পড়ে গ্যাছে দ্রোহী। সেলুনে গিয়ে বলল তিন নম্বর মেশিন ব্যবহার করতে। তা নাপিত বাবাজি পুরো মাথায় তিন নম্বর মেশিন চালিয়ে একেবারে ফ্লাট করে দিয়েছে। ছাতার তলায় বাটি ছাট দেবার মত হয়েছে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছে সবাই যেন দ্রোহীর দিকে তাকাচ্ছে। এমন হাবার অবশ্য কোন কারণ নেই। ঢাকা শহরের মানুষ অনেকটা নিউইয়র্ক সিটির মানুষের মত ব্যস্ত। তবে ব্যস্ততার কারণ ভিন্ন হতে পারে।

হাবিব আজকে সকালেও আসেনি। অসুখ বিসুখ করল নাকি ছোড়ার। সেতারা ফুপুর বাসায় ফোন করেছিল দ্রোহী। ফুপু স্বয়ং ফোন ধরেছে। কোন রকম ঝড় বৃষ্টির আলামত উনার কথায় পায়নি দ্রোহী। তার মানে সব ঠিক আছে। কিন্তু হাবিবের কি হলো?

লিপির সঙ্গে দেখা করে ফেরদৌস চাচার সংবাদটা দিয়ে, তারপর হাবিবের খোঁজে বের হবে বলে ঠিক করল দ্রোহী।

ড্রইং রুমে সোফার ওপর মায়ের কোলে মাথা রেখে পুতুল শুয়ে আছে।

X কিরে তুলতুল তুই কলেজে যাসনি?

X নাহ। যাবো না। বলে ভেতরের ঘরে চলে যায় পুতুল।

X কি ব্যাপার বুবু, ওর মন খারাপ কেন?

X আর বলিস না। গলির মোড়ে প্রতিদিন কিছু বখাটে ছেলে এই সময় আড্ডা দেয়। আর ও ঐ দিক দিয়ে যেতেই সব বাজে কমেন্ট করে। কালকে নাকি রীতিমত পথ আটকে দাঁড়িয়েছে।

X তো হাসান ভাইর সঙ্গে যায় না কেন?

X আর তোর হাসান ভাই। সেই কোন সকালে বের হয়। ইদানিং আবার একটা পার্ট টাইম ধরেছে। যা বেতন পায় তা দিয়ে তো ------

অভাব অভাব। যদি একটা আলাদীনের চেরাগ থাকত অথবা খুল যা ছিম ছিম। তাহলে সমস্ত অভাব এক নিমিষে মিটিয়ে দেওয়া যেত।

X কই তুলতুল, চল আমি তোকে রিক্সা করে দিয়ে আসি।

X না মামা তুমি জান না ওরা খুব বাজে ছেলে।

X আচ্ছা দেখা যাবে তুই চল তো।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যাগ নিয়ে দ্রোহীর সাথে হাঁটতে শুরু করে পুতুল।

ছেলেগুলো একেবারে প্রস্তুতই ছিল। পুতুলকে দেখা মাত্র সিটি শুরু হয়ে যায়। দু'একটা অশ্লীল খিস্তি বাতাসে ভেসে আসে। কেউ একজন বলে ওঠে

X নয়া পাগল মনে হইতাছে। দিমু নাকি হালারে, সাইজ।

একটা খালি রিক্সা ডেকে পুতুলকে উঠিয়ে দেয় দ্রোহী। পুতুল চলে যাবার পর ধীরে ধীরে ছেলেগুলোর কাছে আসে দ্রোহী।

X শোন ছোট ভাইরা। মেয়েদের ----

পুরোটা শেষ করতে পারে না দ্রোহী। টমি হিলফিগার টি শার্ট পরা এক যুবক খিস্তি করে ওঠে।

X আরে হালায় রংবাজী করবার লাগছে। মাল মনে হয় বিদেশী। ধরতো হালারে।

দুই জন টপ করে দুই হাত ধরে দ্রোহীর। পিস্তলের একটা নলও ঠেকে দ্রোহীর পাকস্থলীর কাছে।

X চোপ একদম চোপ। ঐ কোনায় চল।

দ্রোহীকে ঠেলে কোনায় নিয়ে যায়। এলো পাথাড়ী দুই চারটা ঘুষি আর লাথি পড়ে ইতিমধ্যে।

একজন পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগ বের করে।

X ঠিকই কইছস, হালায় বিদেশী জিনিষ। চল হালারে অফিসে নিয়া সাইজ দেই।

ওরে বাব্বা এদের আবার অফিসও আছে নাকি। উপর্যুপরি আরও কিছু কিল ঘুষি পড়ে ইতি মধ্যে। চল মান্দার পুত। একদম তাংফাং করবি না। দ্রোহীর পশ্চাত দেশে লাথি মেরে একজন হাঁটার নির্দেশ দেয়। আশে পাশের দোকানগুলো থেকে উৎসুক জনতা বেশ মজা করে দেখছে। দ্রোহী জানে এদের কাছে সাহায্য চেয়ে বা চিৎকার করে কোন লাভ নেই।

এখন বেশ ভয় ভয় লাগছে। বড় রাস্তায় খুন করলে তো অন্ত ত লাশটা খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু এদের অফিস না কি ঐ খানে করলে?

দোতলা একটা পুরানো বাড়ির ভেতরে ঢোকায় দ্রোহীকে ছেলেগুলো। ছেলেগুলো বেশ তড়িৎ কর্মা কোত্থেকে নাইলনের দড়ি এনে টপটপ বেঁধে ফেলে ওকে।

চাপার হাড়টা বুঝি ভেঙ্গেই গ্যাছে। তলপেটে প্রচন্ড ব্যথা। বমি আসছে। ওয়াক ওয়াক করে বমি করে দেয় দ্রোহী। ছেলেগুলো নিজেদের পরিপাটি জামা রক্ষার তাগিদে নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়।

X গুরু আইছে গুরু আইছে। কেউ একজন বলে ওঠে। সবার মধ্যে বেশ সচকিত ভাব।

স্লামালাইকুম বস। বিদেশী জিনিস। শালায় রংবাজী করবার লাগছিল। বিচ্চি দুইডা খুইলা রাইখ্যা দিমু?

আগন্তুক অর্থাৎ গুরু বা বস হাত পা বাঁধা দ্রোহীর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। দ্রোহীও তাকিয়ে আছে গুরু নামের আগন্তুকের দিকে। স্কুলে থাকতে ওর এক বন্ধু ছিল ফারুক নাম। সবাই বলত ন্যাংটা ফারুক। অনেকটা ফারুকের মত লাগছে।

ওর হাত পায়ের বাঁধন খুলে দে।

নিশ্চিত আজরাইলের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিল দ্রোহী। দোয়া দরুদ যা আছে ইতিমধ্যে পড়াও হয়ে গ্যাছে। আজরাইল যেন কি কারণে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। হয়ত বা একই নাম বা জন্ম তারিখের অন্য কারও -----। কে জানে।

বন্দী খানা থেকে বের করে একটা অফিস ঘরে বসায় দ্রোহীকে। তবে এবারে গায়ে হাতটাত তোলে না। অফিস ঘরটা বেশ সাজানো গোছানো। ঘরের কোনায় সোফাসেট। কার্পেট বিছানো। দেয়ালে জিয়াউর রহমানের সেই বিখ্যাত ছবি। খাল কেটে ক্লান্ত জিয়া, বসে বিশ্রামরত। বসার জন্য একটা রিভলভিং চেয়ার, সামনে বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের চারদিকে চেয়ার পাতা। ডেকোরেশনের চেয়ারে না, রীতিমত নরম গদীওয়ালা চেয়ার। এরকমই একটা চেয়ার দ্রোহীকে বসানো হয়। সিনেমা কায়দায় কোন ইশারা করতে হয় না, চ্যালা চামুন্তারা সব একে একে বাইরে বেরিয়ে যায়।

X আমার যদি ভুল না হয় তাহলে তুই দ্রোহী। বস ওরফে গুরু ওরফে মহান নেতার আদর্শের সৈনিক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রশ্ন করে দ্রোহীকে উদ্দেশ্য করে।

ক্লান্ত, অবসন্ন, শুষ্ক কণ্ঠ, কথা বলার শক্তি অবশিষ্ট নেই দ্রোহীর।

মর্দ হাঁসের মত ফ্যাস ফ্যাস করে উত্তর দেয় দ্রোহী।

X তুই ফারুক না?

বিজয়ীর হাসি হাসে ফারুক। কে বলবে এই ফারুককে ক্লাশ থ্রিতে থাকতে বন্ধুরা মিলে ন্যাংটা করেছিল। সে যে কি কান্না ফারুকের। সেই থেকে ফারুকের নাম ন্যাংটা ফারুক। ক্লাশে আরেক ফারুক ছিল। তার টাইটেল ছিল হাফ প্যান্ট ফারুক।

X ফারুক তুই কি আমাকে এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারবি? ফারুকের রিভলভিং চেয়ারের পাশেই ছোট একটা রেফ্রিজারেটর ন্যাশনাল কোম্পানীর। ফ্রীজ খুলে এক বোতল মিনারেল ওয়াটার বের করে দ্রোহীর সামনে রাখে ফারুক।

এক টানে পুরো বোতল শেষ করে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে থাকে দ্রোহী। আস্তে আস্তে বোধ শক্তি ফিরে পাচ্ছে সে।

X তা তুই এখানে কি করিস। গ্যাংলীডার বা মাফিয়া নাকি কোন রাজনৈতিক --

আমি এই ওয়ার্ডের কমিশনার। তা তুই এখন কি করছিস? মানে কোন দেশে থাকিস।

X আমেরিকায়।

অনেকক্ষণ নীরব থাকে ফারুক। সামনের ক্রীস্টাল টেবিল ওয়েটটা এক হাত দিয়ে ঘোরাতে থাকে সেই সাথে -

X শোন দোস্ত। আমি জানিনা আমার লোকজনের সাথে তোর কি হয়েছে। যাই হোক না কেন তা হয়ে গ্যাছে। আর তোকে যে মেরেছে তাও অতীত। আমার পক্ষে সম্ভব না ওদেরকে পাল্টা পেটানো। তবে ভবিষ্যতে আর এ ধরণের কিছু হবে না এই নিশ্চয়তা দিতে পারি। এবার বলতো ঘটনাটা কি?

সংক্ষেপে ঘটনাটা খুলে বলে দ্রোহী।

সবগুলো উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে হেসে ওঠে ফারুক।

X শোন দোস্ত, অনেক দিন দেশের বাইরে আছিস তাই এগুলো অনিয়ম লাগছে। কিন্তু এটাই নিয়ম। রাস্তা দিয়ে মেয়েরা যাবে আর ছেলেরা দুষ্টামি করবে না তা হয় নাকি? তুই করিসনি, আমরা করিনি?

X হ্যাঁ করেছি কিন্তু দু'একটা ছোট খাটো কমেন্ট। রাস্তা আগলে দাঁড়ানো, অথবা অভিভাবকের সামনে অশ্লীল খিস্তি। আবার কিছু বলতে গেলে খুন করার জন্য গোপন আস্তানায় নিয়ে আসা। এগুলো কোন ধরণের নিয়ম। তুই মনে কিছু করিস না।

তোকে কমিশনার হিসেবে কথাগুলো বলছিনা। ন্যাংটা ফারুক হিসেবে বলছি।

X হো হো হো। অনেক অনেক দিন আগের কথা মনে করিয়ে দিলি? হাসি থামে না ফারুকের। হাসতে হাসতে এক সময় ফেঁদে কেঁলে।

X খুউব ইচ্ছে করে দোস্ত সেই সব দিন গুলোতে ফিরে যেতে। এই সব হানাহানি, নির্বাচন, ক্ষমতা, নেতা নেত্রী, বোমা পিস্তল, হরতাল, মিছিল, মিটিং কিচ্ছু ভালো লাগেনা। যদি পারতাম তাহলে এই মুহূর্তে সব ছেড়ে দিতাম।

X চাইলেই পারিস।

X নাহ পারি না। যে দিন ছাড়া, তার পর দিন বা সেই দিনই ইন্নালিল্লাহ। ঢাকা শহরে এ রকম ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। এমনকি ছাড়তে হয় না ক্ষমতায় থাকাকালিন অবস্থাতেই। যাদের ঈশারায় আমরা চলি তারা যদি মনে করে দরকার নেই তাহলে ব্যাস কিস্‌সা খতম।

কিছুক্ষণ থেমে আবার শুরু করে ফারুক।

X ভাবছি তোদের আমেরিকায় পারি জামাবো। ঐ যে দেয়ালে ছবিটা দেখছিস ঐ নেতার ছবি নামিয়ে এখন পিতার ছবি লাগাবো বলে ঠিক করেছি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে, তারপর আমাদের মেয়রের সঙ্গে আজকাল বিভিন্ন সন্ত্রাস বিরোধী সভা সমিতিতে হাজিরও হচ্ছি। আগামী জুনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহেব সম্ভবতঃ কোন সেমিনারে আমেরিকা যাচ্ছে। উনার সঙ্গে কথাও হয়েছে। দেখি যদি যেতে পারি সফর সঙ্গী হিসেবে। বাচার একমাত্র পথ বন্ধু।

X তোর হাবিবকে মনে আছে?

X হ্যাঁ জানি। কিন্তু হাবিবের একটা সুবিধা ছিল সেও কখনও নিজেকে ফোটানোর চেষ্টা করেনি। ইচ্ছা করেছে ভাল হয়ে যেতে পেরেছে। কিন্তু আমার ব্যাপারটা একটু ভিন্ন।

X তোর সাথে কথা বলে অনেক ভাল লাগল। এবার কি আমি যেতে পারি? নাকি তোর লোকের আরও কোন পর্ব বাকি আছে?

X সেকি এতদিন পর দেখা হলো বাসায় যাবিনা? আমার বউর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই চল। বছর দুই আগে ভাগিয়ে এনে বিয়ে করেছিলাম। একটা বাচ্চাও হয়েছে। বলতে পারিস এই বচ্চাটার জন্যই সুন্দর ভাবে বাঁচতে খুব ইচ্ছে জাগে। নে চল।

X কিন্তু আমার বোন চিন্তা করবে।

X অসুবিধা নেই আমরা যাবার পথে তোর বোনের বাসায় বলে তারপর যাবো।

রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই সাদা রঙের একটা হোন্ডা সিভিক থেকে ড্রাইভার নেমে ফারুককে সেলুট দেয়। বোঝা যায় এটা ফারুকের গাড়ী।

X গাড়ীতে যাবি না হেঁটে। খুব সামান্য পথ অবশ্য।

X হেঁটে উত্তর দেয় দ্রোহী।

X হ্যাঁ সেই ভাল। দ্রোহী দোস্ত তোকে পেয়ে আমার কি যে ভাল লাগছে। আমি কি তোর গলা ধরে হাঁটতে পারি। স্কুল লাইফে যেমন রাস্তায় হাঁটতাম।

X ও দেশে ছেলেরা গলা ধরে হাটলে কি বলে জানিস? গে।

X গে মানে?

X হোমো সেক্সুয়াল, সমকামী।

X আরে ধ্যাৎ ওরা কি বোঝে গলা ধরে হাঁটার আনন্দ। দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। কিছুটা ইতস্তত করে ফারুকের কাঁধে হাত রেখে এক পা দু'পা করে হাঁটতে থাকে দ্রোহী। সেই সাথে এক দিন দু'দিন করে পেছনে ফিরতে থাকে। বাহ্‌ চমৎকার! একই সাথে সামনে চলা, আবার পেছনে না তাকিয়েও পেছন দেখা। পেছন ফিরে যাচেছ ওরা। পেছনে অ-নে-ক পেছনে।

॥ চৌদ্দ ॥

সেদিন রাতে হল থেকে ফেরার পর সেই যে শয্যা নিয়েছে বর্ষা। প্রচন্ড জ্বরের ঘোরে চোখে শুধু নানান রঙ্গের খেলা দেখছে। সেই রংগুলো কখনও রং ধনুর মত একসাথে, কখনও শুধু লাল, আবার কখনও গাঢ়ো সবুজ। আবার কখনও রংগুলো গোল গোল বেগুনের মত আকার ধরে ভেসে বেড়িয়েছে বর্ষার চোখের সামনে। তার মধ্যে দ্রোহীর কথাটা মনে পড়েছে? অথবা আবোল তাবোল বকেছে। বকেছে কি? বকতে পারে মনে পড়ছে না বর্ষার। এই মুহূর্তে সে তার নিজের ঘরে লেপের নীচে শুয়ে আছে। অসম্ভব ক্লান্তি আর অবসাদে ভরে আছে দেহ মন। মুখটাও তেতো বিস্বাদে ভরা। তবে মাথাটা অসম্ভব হালকা লাগছে। আজকের বার তারিখ মনে করার চেষ্টা করে বর্ষা। মনে পড়ে না মাঝখানে কদিন পার হয়ে গ্যাছে। বেড সুইচ জ্বেলে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায় সে। সাড়ে বারোটা বাজে। কিন্তু কি বার বা কত তারিখ এই মুহূর্তে জানার উপায় নেই।

আচ্ছা এর মধ্যে কি দ্রোহী ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিল? হলে না পেয়ে নিশ্চয়ই মন খারাপ করে ফিরে এসেছে। তারপর হয়ত বাসায় ফোন করেছে। নাহ্‌ করেনি হয়ত। করলে সে টের পেত। মাথার কাছেইতো ফোন। কিই বা এমন জ্বর যে ক্রিং ক্রিং ক্রিং ছেলিফোনের শব্দ শুনতে পাবে না। একটা ফোন করলে ক্যামন হয়।

ভয়ে ভয়ে নম্বর ঘোরায় বর্ষা।

তিন বার রিং বাজার পর ফোন ওঠায় কেউ।

X হ্যালো।

চুপচাপ থাকে বর্ষা। কোন কথা বলে না।

X হ্যালো। বর্ষা আমি জানি তুমি ফোন করেছ। কথা বল।

X কি বলব?

X হাই হ্যালো জাতীয় কিছু।

X হাই।

X হ্যালো, ক্যাপাসো?

X মানে?

X মানে ক্যামন আছ। স্প্যানিশ।

X এর উত্তরটা কি হবে?

X যদি ভাল থাকো তাহলে উত্তরটা হবে বিয়েন, মুই বিয়েন, ভাল খুব ভালো।

X আর যদি ভাল না থাকি?

X ভাল নেই নাকি?

X নাহ্।

X ওয়াগুম নিকসট?

X ধ্যাৎ কি সব বলেন। এটার মানে কি?

X এটার মানে হচ্ছে ডযু হড়ঃ? জার্মান।

X বা ব্বা আপনি এত ভাষা জানেন?

X একটা কৌতুক শুনবে?

X শুনব। খুব বেশী হাসির?

X নাহ্। অল্প হাসির। তবে বুঝলে অনেক হাসির। দুই ভদ্রলোক গল্প করছে। একজন আরেক জনকে বিভিন্ন দেশের গল্প বলছে। যেমন ধর লোকটি বলছে আমি চীনের প্রাচীর দেখেছি, মিশরে ছিলাম অর্ধ দিন, গ্রীসের এয়ারপোর্টটা খুব সুন্দর, তাজমহলের পাথর গুলো ইত্যাদি ইত্যাদি। তো দ্বিতীয় জন বলছে তাহলে তো সাহেব জিওগ্রাফী সম্পর্কে আপনার ভাল ধারণা আছে।

তখন প্রথম জন উত্তর করছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঐখানেও তো ছিলাম এক মাস। ধারণা থাকবে না?

হি হি হি অপর প্রান্তে হাসির রোল ওঠে। কিন্তু একটু পরেই খুকখুক কাশিতে হাসি আটকে যায়।

X তোমার কি হয়েছে বর্ষা?

X সর্দি, জ্বর, মাথা ব্যথা, রঙের খেলা দুঃস্বপ্ন।

X বল কি এত কিছু একসাথে? বড় হলে তো তুমি অসুখ বিশেষজ্ঞ হবে।

X ফাজলামো হচ্ছে না। আচ্ছা আপনি এ ক'দিন একটা বারও খোঁজ নিলেন না। মরেও তো যেতে পারতাম।

X আই অ্যাম সরি বর্ষা। আসলে আমার এক চাচার ক্যান্সার ধরা পড়েছে। শেষ পর্যায়ে। তারপরও আশা তো ছাড়া যায় না। হসপিটালে ভর্তি করা, উনার বউ বাচ্চা দেশ থেকে আনার ব্যবস্থা, সকাল বিকাল হাসপাতালে যাওয়া এসব নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম।

X আপনার আপন চাচা?

X না। দুঃসম্পর্কের। কিন্তু পর হয়েও অতি আপন। জগতে আমার দেখা বা জানা যে দু'এক জন ভাল মানুষ আছে তার মধ্যে এই ভদ্রলোক সবচেয়ে সেরা। নাম তার ফেরদৌস চাচাকে ঘিরে আমার শৈশবের অনেক স্মৃতি আছে শুনবে।

X নাহ রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখী মানুষ এসব শুনতে ভাল লাগছে না। তার চেয়ে অন্য কথা বলেন। জন্মের কথা, জীবনের কথা, আনন্দের কোন কথা। নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক কিছু।

X তাহলে একটা মজার কথা শোন। সেদিন হঠাৎ আমার পুরোনো এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। ফারুক। ন্যাংটা ফারুক।

X হি হি এটা আবার ক্যামন নাম।

X ক্যানো ঢাকা শহরে তো এ ধরণের নাম অনেক শোনা যায়। এই যেমন ধর গাল কাটা কামাল, আংগুল ফোলা মোবারক, টোকাই সাগর, কালা জাভেদ, মুর্গী মিলন বাস্টার্ড সেলিম।

X আপনার ন্যাংটা ফারুকও ঐ রকম কেউ নাকি?

X ঐ রকমই। তবে ক্যাডার জগতে ওর নাম ছোট ফারুক। আর ন্যাংটা ফারুক হচ্ছে ওর স্কুল জীবনের টাইটেল। বন্ধুরা মিলে একবার ওকে ন্যাংটা করে দিয়েছিলাম সেই থেকে হি হি হি ওর নাম ন্যাংটা ফারুক। আর আরেক ফারুক ছিল সব সময় হাফপ্যান্ট পরে ক্লাশে আসত। ওর নাম ছিল হাফ প্যান্ট ফারুক। এ ফারুক হয়েছে শুধু ক্যাডার আর হাফপ্যান্ট ফারুক শুনেছি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে, যাকে বলে বিসিএস ক্যাডার। পঞ্চগড়ে পোস্টিং। হে হে হে -

X এত খোঁজ রাখেন? তা আপনার বন্ধু আপনাকে দেখে কি করল?

X প্রথমে ধোলাই, তারপর জড়িয়ে ধরল। বাসায় নিয়ে গেল। ওর বউর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। অদ্ভুত সুন্দরী এক মহিলা। কুচ বরণ কন্যা লো তার মেঘ বরণ কেশ। আমি তো বললাম আপনি কেশ তেলের বিজ্ঞাপণ করেন না কেন? শুনে তো জুলেখা ----

X থাক আর জুলেখার কথা বলতে হবে না। অন্য কথা বলেন।

X অন্য কথা বলব? ও আচ্ছা। আমার সেই যে ইয়ার দোস্ত , হাবিবের কথা মনে আছে?

X উনার আবার কি হয়েছে?

X আরে কি হয়নি তাই বল। নাহারের সঙ্গে ওর গিট্টু লেগে গেছে।

X নাহারটা আবার কে?

X নাহার? ও হো হো সে আরেক আসমানের পরী। হাসিলে মাশাল্লা মুক্তো ঝরে। নূরুন্নাহার নামটার মানে জানো তো?

X নূরুন্নাহার এমন কোন সুন্দর নাম না যে মানে জানতে হবে। আমার সামনে ওসব ফাল্তু নাম আর উচ্চারণ করবেন না। অন্য কোন কথা বলেন।

X অন্য আর কি বলব বল। বড় কষ্টে আছি।

X আবার কষ্ট কিসের?

X এই যে সবাই ক্যামন সৎ পাত্রীস্থ হলো। শুধু আমারই কোন সুরাহা হলো না। শালার কপালটা যদি আর একটু চওড়া হতো।

X আহারে, খুব দুঃখ না? তা সেই ডাক্তারনীর কি খবর?

X ডাক্তারনী না, অন্য আরেকটা মেয়ে দেখেছি। মেয়েটার নাম আয়েশা। দেখতে --

X থাক আয়েশা দেখতে ক্যামন বলতে হবে না। অন্য কথা বলেন।

X কি মুশকিল যাই বলি তাতেই শুধু বল অন্য কথা বলেন। অন্য আর কি বলব?

X এই যেমন আকাশ, চাঁদ, পূর্ণিমা, জোৎস্না, সপ্তঋষি, স্বাতী, দীঘি, শাপলা, নীল পদ্ম, মাছরাঙ্গা, বউ কথা কও, দোয়েল কোয়েল, ময়না, শ্যামা, পদ্মা, মেঘনা, করতোয়া, তিস্তা, কর্ণফুলি, গোমতি, মধুমতি, চম্পা, চামেলী, জুঁই, জবা, কৃষ্ণচূড়া, লাল, লীল, হলুদ, গোলাপী, গ্রীক পূরাণ, আরব্য রজনী, রোমিও জুলিয়েট যা ইচ্ছে।

X আমি যে এসবের কিছুই জানিনা।

X তাহলে কবিতা।

X কোনটা? প্রথমতঃ আমি তোমাকে চাই?

X ধ্যাৎ ওটা তো ভাঙ্গা রেকর্ড হয়ে গ্যাছে। লতা ওল্ড হিটস ভলিউম ওয়ান টু আর থ্রীর মত।

X আর কোন কবিতা যে আমি জানি না।

X তাহলে কিছু বলার দরকার নাই। এমনিই ফোনটা কানে ধরে রাখেন।

X কতক্ষণ?

X অনেক অনেক ক্ষণ, সারারাত, অনন্ত কাল।

॥ পনের ॥

লোকটার নাম হাসেম চৌধুরী না হয়ে হাজাম চৌধুরী হওয়া উচিত ছিল। দ্রোহীর খৎনার সময় যখন হাজাম আসল তখন সে দৌড়ে বাথরুমে খিল আটকে পালিয়েছিল। ছেলেদের খৎনার স্মৃতি আর তার পেছনের খলনায়ক অর্থাৎ হাজামের চেহারা তার এখনও মনে আছে। দ্রোহীর সামনে বসা হাসেম চৌধুরীকে খৎনা হাজামের ক্লোনিং বলা যায়। ইয়া বড় ভুড়ি, ভারী গোঁফ, কালো কুচকুচে গায়ের রং পরনে একটা সাদা পাঞ্জাবী। তবে হাজামের পাঞ্জাবীটা ছিল আরও মলিন, পুরোনো আর তেলচিটে। কে জানে পঁচিশ বছরের আগের হাজামই এখন হাসেম কিনা। আল্লাহ পাকের লীলা খেলা বান্দা বোঝে সাধ্য কি? পঁচিশ বছর আগের হাজাম আজকের হাসেম চৌধুরী হলে হতেও পারে। বিশাল গার্মেন্টস, ডক ইয়ার্ডের ব্যবসা, প্রাসাদ সম বাড়ী। ভদ্রলোক তিন কন্যার জনক। বড় জন ডাক্তার, পরের জন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে বি বি এ, তার পরের জন সদ্য উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছে।

X তোমার নাম দ্রোহী।

X জী স্যার।

X নামটা বেশ কঠিন। তা তুমি করে বললাম বলে মনে কিছু করনি তো।

X না না কিযে বলেন স্যার।

X তুমি বলেছিলে অ্যাপ্লাইড ক্যামিস্ট্রিতে বি এস করেছ।

X কথা বলার সময় দুই এক ফোটা পানের পিক এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে। টেবিলের ওপর ফাইল পত্রে পানের পিকের ফোটা ফোটা দাগ লক্ষ্য করা যায়। হাজাম চৌধুরী কথা বলার এক ফাঁকে পানের পিক ফেলে টেবিলের নীচে রাখা পোর্টেবল পিক দানিতে।

আবার বলতে শুরু করে হাজাম।

X স্টেইটসে এ্যাপ্লাইড ক্যামিস্ট্রিতে আন্ডার গ্র্যাড করে সত্যিকার অর্থে -----

হ্যাঁ। আন্ডার গ্যাডের তেমন মূল্য নেই। গ্র্যাড করার ইচ্ছে আছে। তবে তা নির্ভর করছে পরিস্থিতির উপর।

X আমেরিকায় এম, ডি করতে কি পরিমাণ খরচ হয় তা কি জানো?

X জ্বীনা স্যার। আমি কখনও এমডি করার চিন্তা ভাবনা করিনি তাই খোপও নেইনি।

X না না তা বলছিনা। এ ফাঁকে হাজাম আবারও পিক দানিতে পিক ফেলে।

X মানে আমি বলতে চাইছি তুমি গ্র্যাড করতে চাইছ। আমার মেয়ে এম বি বি এস করেছে। ওর ইচ্ছা এমডি করার। তুমি কি এ্যাফোড করতে পারবে?

ব্যবসায়িক চুলচেরা হিসেবের কথা। বিয়ে নয় তো যেন বাণিজ্য করতে এসেছে দ্রোহী। তুই ব্যাটা হাজাম, হাজাম ছেড়ে ধরলি কাস্টমসের চাকুরী। চোরাকারবারীদের নিয়ে কারবার। তাতেও তোর হলো না ধরলি গেন্‌জি আণ্ডার ওয়্যার বানানোর কাজ, তা থেকে গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। যে চোরাকারবারীদের নিয়ে বাণিজ্য করতে পারে সে দর্জির কাজও করতে পারে। যে দর্জি সে লোহা লক্কড়, ইস্পাত লঞ্চ, জাহাজ নিয়ে নাড়া চাড়া করতে পারে। কিন্তু সে কি কন্যার বিয়ে নিয়েও বাণিজ্যিক চুক্তি করতে পারে? শালা ফাঁদ দেখেছ ঘুঘু দেখনি। একটু গলা খাকারি দিয়ে নড়ে চড়ে বসে দ্রোহী। তারপর হাজামের চোখে চোখ রেখে একটু মুচকি হেসে বলে।

X স্যার। ব্যাপারটা হয়েছে কি আপনার মেয়েকে আমি এখনও দেখিইনি। দুজন দুজনকে দেখার পর যদি প্রাথমিক ভাল লাগা , লেগে যায় তারপর পরস্পর কথা বলার প্রশ্ন। কথা বার্তায় যদি ভাল লেগে যায় তবে অন্যান্য ব্যাপারে আরেকটু এগুনো যায়। বিয়েটা গাণিতিক সমীকরণ নয়। একপাশে দুই আর দুই থাকলে অন্য পাশে চার নাও হতে পারে। তবে সাড়ে তিন পৌঁনে চার বা সোয়া চার হলেও চলে।

হাজাম চৌধুরী হা করে তাকিয়ে আছে দ্রোহীর দিকে? পানের পিক ফেলতে খেয়াল নেই বলে দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে লাল পিক গড়িয়ে গড়িয়ে চিবুক পর্যন্ত এসে পড়েছে। আরেকটু হলে টেবিলে রাখা ফাইলে টপ করে পড়ত খেজুরের রসের মত।

X আপনি মনে হয় পিক ফেলতে ভুলে গ্যাছেন।

X উম্ ও হ্যাঁ। ভদ্রলোক বা হাত দিয়ে টেবিলের নীচে পিক দানি খোঁজে।

X স্যার পিক দানি মনে হয় ডান দিকে।

পিক দানি খোঁজার আশা ছেড়ে পিক সহ ঢোক গেলে হাজাম চৌধুরী।

X হ্যাঁ তা যা বলছিলাম। প্রথমে আপনার মেয়েকে আমার এবং আমাকে আপনার মেয়ের ভাল লাগতে হবে। তারপর বৈষয়িক প্রশ্ন। ধরা যাক দুজনে দুজনার ভাল লেগেই গেল। তো কি? বিয়েটা একটা চুক্তি বটে কিন্তু অন্যান্য বা বাণিজ্যিক চুক্তির সঙ্গে এর তুলনা চলে না। আমি নিজেকে কোন অবলিগেশনের মধ্যে রাখতে চাই না। বললাম আপনার মেয়েকে এম ডি করাবো কিন্তু নানা বিধ কারণে পড়ানো হলো না তখন?

হাসেম চৌধুরী কিছু একটা বলতে চায়। কিন্তু দ্রোহী তাকে সুযোগ না দিয়ে বলতে থাকে। আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমি বিয়ের পাত্র আমার চাহিদা কনে। আমি রোগী নই যে ডাক্তারনীর চাহিদা থাকবে। অন্যান্য সবার মতই আমারও চাহিদা আছে। মেয়ে সুদর্শনা, সুশিক্ষিতা এবং ভদ্র পরিবারের হতে হবে। আমার বিয়ের কনে যদি ডাক্তারনী না হয়ে মাস্টারনি হয় তাতেও কোন অসুবিধে নেই।

একটু খানি দম নেয় দ্রোহী। ভদ্রলোকের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে জরিপ করার চেষ্টা করছে সে। নাহ সেয়ানা মাল। দিব্যি হজম করে বসে আছে। প্রায় কান পর্যন্ত ঠেকিয়ে হাজাম চৌধুরী একটা হাসি দেয় শব্দ না করে। এই হাসির মানে অনেক কিছু হতে পারে। বাছা তোমাকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। মেয়ে আমি তোমার কাছেই বিয়ে দেব। অথবা হতে পারে আরে ব্যাটা দুই দিনের বৈরাগী ভাতেরে বলে অন্ন। স্পষ্টবাদী সেজে আমাকে বোকা বানানো? সেটি হবে না।

X তোমার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল। আমি পরে তোমার ভাইর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব। ওকে ইয়ং ম্যান।

হাসেম চৌধুরীর অফিস কাম গার্মেন্টস থেকে যখন দ্রোহী রাস্তায় বেরুল তখন সূর্য ঠিক মাথার ওপর। এই দুপুর রোদ মাথায় করে বড় রাস্তা ধরে বিশাল এক মিছিল চলে যায় হরতাল বিরোধী। হরতালের পক্ষে মিছিলের চাইতে বিপক্ষের মিছিলই আজ কাল বেশি দেখা যায়। আর এসব মিছিলের নেতৃত্বে সাধারণত মন্ত্রী বা স্থানীয় এমপিরা থাকে। এই মিছিলটির নেতৃত্বে আছেন হাজী সাহেব নামের এক এমপি। লাল ব্যানারে উজ্জ্বল হরফে লেখা হাজী সাহেবের নাম দেখতে পায় দ্রোহী। নামের শেষে আবার লেখা এম পি। বি এস সি, এম এস সির মত এম পি টাও টাইটেলের মত ব্যবহৃত হতে দেখে একটু অবাকই হয় দ্রোহী। আলেকজান্ডার দি গ্রেট এক সময় এদেশে এসে বলেছিল কি বিচিত্র সেলুকাস -- ইত্যাদি ইত্যাদি। তা অ্যালেক্স সাহেবকে আজকের ঢাকা শহরে এনে ছেড়ে দিলে কি বলত? হয়ত কিছুই না প্রাণের ডর কার না আছে? মিছিলের পেছনে পাঁচ সাতটা পুলিশ ভ্যান। তারও পেছনে আটকে পড়া রিক্সা বেবী, প্রাইভেটকার মিশুক, ট্যাম্পু আর ঠেলা গাড়ী। নারী পুরুষ, যুবক বৃদ্ধ, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী, বেকার। চোখে মুখে এদের রাজ্যের বিরক্তি। অন্য কোন রাস্তা দিয়ে যাবে? লাভ নেই। সেই রাস্তায় হয়ত রিক্সা চলে না অথবা হরতাল পক্ষের মিছিল। নেতা তুমি এগিয়ে চল তা সে হরতালের পক্ষে হোক আর বিপক্ষে হোক আমরা আছি তোমার এবং তোমার ক্যাডারদের পিছে।

মোহাম্মদপুর থেকে আসাদ গেইট পর্যন্ত আসতেই ঘেমে নেয়ে যায় দ্রোহী। ক্ষুধা আর তেষ্টা দুটোই পেয়েছে ভীষণ। কোন এক রেঁস্তোরায় বসবে বলে ঠিক করে দ্রোহী। কিন্তু পর মুহূর্তে গুলিস্তান থেকে আরিচা মুখী একটা বাস, স্টপেজে থামে। বাসে যাত্রী তেমন নেই। বাঁদর ঝোলা হতে হবে না। কয়েক সেকেন্ড ভাবে দ্রোহী। তেষ্টাটা এখনও আর অনুভূত হচ্ছে না। ক্ষুধা? এটা আবার কি জিনিস।

দ্রোহীর পৃথিবী থেকে এই মুহূর্তে সব, সব কিছু ডাইনোসরের মত বিলুপ্ত হয়ে গ্যাছে। শুধু গুটি কয়েক জিনিস বাদে। সেই গুটি কতক জিনিসের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ঢাকা আরিচা রুটের বাস, দ্বিতীয়টি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেইরী ফার্ম গেইট, তৃতীয়টি প্রীতিলতা হল আর চতুর্থ এবং শেষ? সে একজন। শুধুই একজন। দ্রোহীর প্রতি রক্ত কণিকায়, অস্থি মজ্জায়, অণুতে পরমাণুতে হৃৎপিন্ডের আবিস্কৃত এবং অনাবিস্কৃত প্রতিটি প্রকোষ্ঠে অথবা তেইশ জোড়া ক্রমোজমের প্রতিটি ক্ষারক যুগলে যে তথ্য লুকানো আছে সে আর কেউ নয় তার মানসী।

॥ ষোল ॥

মোতালেব চৌধুরীর ক্ষমতা আর অর্থের দম্ভ, বনানীর রাজপ্রাসাদ, ফুলের বাগান, এ্যালসেসিয়ান কুকুর, বয় রেয়ারা বাবুর্চি এবং সর্বোপরি নিজ মাতা সেতারা বেগমের জাতে উঠার আকাশ সম গরিমাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে খুকী ওরফে নূরুন্নাহার একদিন হাবিবের হাত ধরে প্রথমে মহাখালী কাজী অফিস, অতঃপর হাবিবের চার চাকা গরুর গাড়ী এবং শেষে ডাক্তার জাহিদ হোসেন ও জোহরা দম্পতির দাউদকান্দির সরকারি তিন কামরা বিশিষ্ট কোয়ার্টারের পুস্প পর আলোক সজ্জাহীন বাসর যাপনের সফল প্রয়াসে লিপ্ত হলো। বাসর ঘরটা পুস্পহীন হবার কথা ছিল না। জাহিদ সকালে ঢাকা যাবার আগে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দারোয়ান কাম মালিকে বাসর সাজানোর উপযুক্ত পরিমাণ ফুল যোগার করার দায়িত্ব দিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ করে বমী শুরু হওয়ায় দারোয়ান হাসপাতালে শয্যা নেয়। বিকল্প লোক জোগাড় করে ফুল আনতে আনতে বিকেল গড়িয়ে যায়। দু-চার পাঁচ পদ ভাল মন্দ রেধে সবে ফুল গুলো নিয়ে বসেছে জোহরা। এমন সময় গাড়ী বারান্দায় হর্ণের আওয়াজ পাওয়া যায়। ফুলগুলো খাটের ওপর অগোছালো রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় জোহরা। একে একে জাহিদ, দ্রোহী, হাবিব এবং সবশেষে কালো রঙের একখানা জামদানী শাড়ী পরে গাড়ী থেকে নামে নাহার। যদিও নাহার নববধু তদুপরি তারমধ্যে নূন্যতম বধুর সাজ বা ভাব কোনটাই

পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কোয়ার্টারে বসবাসরত জোহরার অত্যুৎসাহী পড়শী গৃহিনীরা একে একে স্ব স্ব বেলকনিতে এসে দাঁড়ায়। সকাল থেকেই চাকর বাকর মারফত প্রচার হয়ে গেছে যে ডাক্তার সাহেবের সম্বন্ধীর বউ এক বিশাল বড়লোকের মেয়ে। বড়লোকের মেয়ের গলায় হাতে কানে নাকে তথা সর্ব শরীরে স্বর্ণালংকারের আধিক্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তা হোক এটা কোর্ট ম্যারেজ। কালো শাড়ী পরিহিতা নুরুন্নাহারকে দেখে পড়শী মহলে উৎসাহের সাময়িক ভাটা পড়লেও মেয়েটির সৌন্দর্য সেই ভাটা পড়া উৎসাহে নতুন করে জোয়ার আনে। আফিসারদের স্ত্রীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত রূপসী হওয়ায় সিনিয়র বা জুনিয়র সকলের স্ত্রীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জোহরাকে হিংসা করে আসছে। এ যে দেখি কয়েক কাঠি সরেস।

কালো শাড়ী পরা নাহারকে নামতে দেখে জোহরাও একটু থতমত খেয়ে যায়। তবে তা ক্ষণিকের জন্যই। শাড়ীতো শাড়ীই। তার আবার লাল নীল আর কালো কি?

ঘরে ঢুকে জাহিদ স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে

X কি ব্যাপার খাট এখনও সাজানো হয়নি?

সংক্ষেপে ঘটনাটা বলে জোহরা।

X অসুবিধা নেই যাদের খাট তারাই সাজিয়ে নিক। কিরে পারবিনা খুকি?

X আমি তো পারব কিন্তু তোমার বন্ধু পারবে কিনা কে জানে। যে ভাবে মুখ গোমড়া করে বসে আছে। মনে হচ্ছে বিয়ে করে বউ না মর্গ থেকে মরা এনেছে।

কাজ করা সিল্কের পাঞ্জাবী আর চুড়িদার পাজামায় সুন্দর মানিয়েছে হাবিবকে।

X কিরে শ্বশুর বাড়ী থেকে পাজামা পাঞ্জাবী যৌতুক পেলি নাকি? রসিকতা করে দ্রোহী।

উত্তর না দিয়ে মুচকী হাসে হাবিব।

X শ্বশুর বাড়ী থেকে যৌতুক পেতে হবে না। শ্বশুর বাড়ীর লোকজন যে কোন সময় এসে কোমরে বিছা পরাতে পারে।

X সেই ভয়েই তো তোমার বন্ধুর মন খারাপ। কই ডাক্তার সাহেব আপনার ছুরি কাঁচি নিয়ে আসেন। তিন মিনিটে নুডুলস রান্নার মত আধা ঘন্টায় খাঁট সাজানো।

জোহরা রান্না ঘরে চলে যায়, আর এদিকে বর কনে এবং দুই সাক্ষী মিলে খাঁট সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বিয়ে বাড়ীর খাওয়া সেরে বর কনেকে বাসর ঘরে বসিয়ে ঢাকা গামী বাস ধরতে ধরতে রাত দশটা বেজে যায় দ্রোহীর। জোহরা এবং জাহিদ অবশ্য অনেক বার অনুরোধ করেছে রাতটা থেকেই যেতে। কিন্তু আগামীকাল হরতাল। রাতের মধ্যে না ফিরতে পারলে কালকেও ফেরা হবে না। আর যদি কোন ক্রমে দু-একটা লাশ পড়ে যায় তবে তো কথাই নেই।

সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে বাস আসতেই প্রো হরতাল একটিভিটিস লক্ষ্য করা যায়। এদিক ওদিক ইট পাটকেলের ছড়াছড়ি। বাস টেম্পুর চাইতে দাঙ্গা পুলিশের খাঁকি পোশাক আর হেলমেটের সংখ্যাধিক্য গোচরে আসে দ্রোহীর। বিবিসির ঢাকা প্রতিনিধির মত না হলেও রিক্সাচালক যে রিপোর্ট বয়ান করল তাতে কিছুক্ষণ আগে টার্মিনালে দুই পক্ষ অটো শ্রমিকদের মধ্যে প্রথমে ইটপাটকেল, তারপর লাঠি-সোটা, তারপর গোলাগুলি তারপর বোমাবাজি এবং বর্তমানে পুলিশ তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসলেও থমথমে ভাবটা রয়েই গ্যাছে।

বাড়িতে ঢোকার সাথে সাথে দৌড়ে কোলে ওঠে অংকন। অংকন এ বাড়ির নতুন অতিথি। শুধু অংকনই না, ওর মা এবং বড় বোন কংকনও এসেছে গ্রামের বাড়ি থেকে। অংকনের বয়স পাঁচ। রোগ, শোক জ্বরা মৃত্যু এসবের কিছুই বোঝে না ছেলেটা। প্রতিদিনই বাইরে থেকে আসার সময় হাতে করে কিছু না কিছু নিয়ে আসে দ্রোহী। তাই দ্রোহী আসার অপেক্ষায় অংকন জেগে থাকে তা যত রাতই হোক না কেন। অংকনকে কোলে নিয়ে দ্রোহীর মনে পড়ল ফেরদৌস চাচাকে আজকে দেখতে যাওয়া হয়নি। জাগতিক আচার রীতি, স্বার্থ, ব্যস্ততা একজন, মৃত্যু পথযাত্রীকে মুহূর্তেই ভুলিয়ে দেয়। মৃত মানুষকেই বা ভুলতে কদিন লাগে?

চকলেট? ফোকলা দাঁতে হেসে হাত বাড়ায় অংকন। ফেরদৌস চাচার বাচ্চা দুটো শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে শিখেছে। এ কৃতিত্ব অবশ্য ওদের মা নূরজাহানের। অভাব অনটন আর নিকটজনের তাচ্ছিল্য যে আভিজাত্যের পালিশ করা দেয়ালে এতটুকু আঁচড় কাটতে পারবে না তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ নূরজাহান বেগম। অভাব, অনটন, রোগ শোক নূরজাহানের আভিজাত্যে ধুলোর আস্তর দিয়ে সামান্য মলিন করেছে বটে। কিন্তু ভদ্র মহিলার কথাবার্তা, চালচলন, পোশাক আশাক দেখলে যে কোন আনজান লোকের সামনেও সেই আভিজাত্যের দ্যুতি দিবালোকের মত পরিস্কার হয়ে দেখা দিবে। নূরজাহান বেগমের এই আভিজাত্য শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তার ফুটফুটে দুই কন্যা সন্তানকে বর্মের মত আগলে রেখেছে।

সালমা বেগমের ঘরের দরজার সামনে নূরজাহান দাঁড়ানো।

অংকন বাবা ভাইয়ার কোল থেকে নেমে আস। ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলে নূরজাহান।

সেই আত্মপ্রত্যয়ী, দিপ্তকাঠি, মলিন অথচ পরিপাটি, শত পরিশ্রমেও ক্লান্তির ছাপ নেই চেহারায় একটু। অন্য সময় হলে মায়ের আদেশ অমান্য করত না অংকন। কিন্তু এই মুহূর্তে আশেপাশে বুলেট নেই। কাজেই গায়ের জোরে দ্রোহীর কোল অধিকার করার ব্যাপারটি নেই। গায়ের জোরে বুলেটের সঙ্গে পেরে ওঠাও সম্ভব না ওর পক্ষে কখনও। তবে মায়ের শৈন্য চাহনী বেশিক্ষণ উপেক্ষা করতে পারে না। গুটি গুটি পায়ে শোবার ঘরে চলে যায়।

চাচী, চাচার শরীর আজকে কেমন?

এ প্রশ্নটি এখানে অবান্তর। তবুও একটা কিছু বলতে হয় তাই বলা। আর প্রশ্ন যখন করা হয়েছেই তখন উত্তরও একটা দিতে হয়। আর তাই নূরজাহান ছোট করে উত্তর দেয় ভাল। তুমি হাতমুখ ধুয়ে আস আমি তোমার খাবার গরম করে দিচ্ছি।

X আমি খেয়ে এসেছি চাচী আর তাছাড়া আপনি কেন? ভাবী কোথায়?

X বউর শরীরটা ভাল নেই তাই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে।

দ্রোহীর স্মরণেই ছিল না যে এ বাড়িতে আরেকজন নতুন অতিথি আসছে।

কংকন বসে আছে দ্রোহীর খাটের ওপর।

কংকন নামের সাথে মেয়েটার বৈশিষ্ট্যের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। চমৎকার গানের কণ্ঠ মেয়েটার। কেবল মাত্র এইট-এ পড়ে। গানের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা নেয়ার সুযোগ হয়নি। অবশ্য কংকনদের জীবনে এধরনের সুযোগ কখনই হয় না।

দ্রোহীর সঙ্গে মেয়েটির ভাব হয়ে গেছে। কংকন হয়ত ওর তের বছরের জীবনে এমন মুগ্ধ শ্রোতা কখনও পায়নি।

X কি গো আপুনি, এখনও ঘুমাওনি।

দ্রোহীর কণ্ঠ শুনে চোখ তুলে তাকায় কংকন ।

X আপনি এত দেরীতে ফিরলেন কেন ভাইজান?

X এমনি একটা কাজে আটকে গেছিলাম। তা কি হচ্ছে খাটে বসে।

X আপনার এ্যালবাম দেখছিলাম। কত্ত সুন্দর, শুধু পাহাড় আর পাহাড়। এই জায়গাটার নাম কি?

এ্যালবামের দিকে ঝুঁকে ছবিগুলো পরখ করে নেয় দ্রোহী।

X এগুলো সব গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ছবি।

X আমাকে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে নিয়ে যাবেন ভাইজান? উদ্ভাসিত প্রশ্ন করে কংকন ।

কংকনের পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে আঁদর করে দ্রোহী।

কংকনের উদ্ভাসিত ভাবটা নিমেষে উধাও হয়ে যায়। এক রাশ কুয়াশার মত ডেকে দেয় কংকনের নিষ্পাপ মুখমন্ডল। নীরব হয় কংকন। কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর দ্রোহীর দিকে করুন চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

X আমি কোনদিন বড় হবো না, তাইনা ভাইজান?

X কে কে বলেছে তুমি বড় হবে না?

X কেউ বলেনি। কিন্তু আমি বুঝেছি। আমার বাবা তো মারা যাবে ক'দিন বাদে। আমাদের বড় করতে মার মেলা কষ্ট হবে। বাবা থাকলে দুজনে মিলে কষ্ট করতে পারত। কথা বলার সময় কংকন কাঁদছে ফুঁপিয়ে।

থুতনিতে ধরে কংকনের ক্রন্দনরত অবনত ছোট্ট মুখমন্ডলকে ঈষৎ উঁচু করে দ্রোহী। বৃদ্ধাংগুলি দিয়ে চোখের পানি মুছে দেয়।

X শোনো বোকা মেয়ে। বাবা কি কারও সবসময় থাকে? এই যে ধর তোমার বাবার বাবা মানে তোমার দাদা। উনি কি বেঁচে আছেন?

ডান বা মাথা নাড়ে কেকা।

X কিন্তু তারপরও তোমার বাবা ঠিইক বড় হয়েছেন। তোমার মার বাবা মানে তোমার নানা বেঁচে নেই কিন্তু তার পরও তোমার মা বউ হয়েছেন। তারপর ধর আমার বাবা বেঁচে নেই। আমি বড় হয়েছি না?

X আপনার তো বড় ভাই আছে। আমার কোন ভাই নেই।

X কে বলল নেই। এই যে তোমার ভাইজান আছে। মিষ্টি করে হাসে কংকন। তারপর বলে, ভাইজান, মাকে একটু বলবেন, আমাকে একটা লেহেঙ্গা কিনে দিতে?

X লেহেঙ্গা কি জিনিস?

X ওমা লেহেঙ্গা কি জানো না?

ডান বায়ে মাথা নাড়ে দ্রোহী।

লেহেঙ্গা হচ্ছে মেয়েদের ড্রেস।

X আচ্ছা ঠিক আছে লেহেঙ্গা কালই পেয়ে যাবে যাও ঘুমিয়ে পড়।

বেশ পুলকিত হয়ে কংকন ঘুমাতে যায়।

কংকন দরজার ওপাশে যাবার পরপরই ঘরে ঢোকে নূরজাহান।

X দ্রোহী তোমাকে কয়েকটা কথা বলব। দু-তিন মিনিটের বেশী লাগবে না। অসুবিধা নেই তো?

X না না চাচী। বলেন কোন অসুবিধা নেই।

চেয়ার টেনে দ্রোহীর মুখোমুখি বসে নূরজাহান।

X এতক্ষণ কংকন তোমাকে লেহেঙ্গার কথা বলছিল তাই না?

X হ্যা। কিন্তু আপনি?

X আমি কিভাবে জানলাম? ভেবো না আমি আড়ি পেতে শুনেছি। ক'দিন ধরেই কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করছে। তোমার কাছে আমার অনুরোধ ওদের কোন রকম কোন আব্দার তুমি রাখবে না।

X ওতো আমার কাছে কিছু চায়নি। বলেছে আপনাকে বলতে যাতে আপনি ওকে একটা লেহেঙ্গা কিনে দেন।

X মুশকিলটাতো ঐখানেই। চালাকি শিখে গ্যাছে। ওদের বাবা একজন সাদাসিধা আধপাগল মানুষ। বৈষয়িক কোন চিন্তা ভাবনা কোনদিন ছিল না। কারো কাছ থেকে কায়দা করে কিছু আদায় করা সেতো প্রশ্নই ওঠে না। আর সেই বাবার মেয়ে হয়ে, ও কিনা কায়দা করে আদায় করা শিখেছে।

X আপনি খামোখা চিন্তা করছেন চাচী। বাচ্চা মানুষ এত কি?

X না না দ্রোহী। তুমি বুঝতে পারছ না। ওর এখন যথেষ্ঠ বুদ্ধি হয়েছে। সামনে আমার মহা সংগ্রামের সময়। ওদেরকে এখন থেকেই বুঝতে হবে যে ওরা গরীব। অভাব, অনটন, রোগ, শোক, জরা, এগুলো ওদের নিত্য দিনের সাথী। ওর গানের গলা সুন্দর দেখে ওর জন্য তুমি হারমোনিয়াম অর্ডার দিয়ে এসেছ। আমি জানলে এটা করতে দিতাম না। আজকে হারমোনিয়াম, দু'দিন

বাদে যদি বলে আমি গানের স্কুলে ভর্তি হবো, নাচ শিখব। আমার সামর্থ কোথায় সে শর্ত মেটানোর? আজকে লেহেঙ্গা চাইছে। তুমি দীর্ঘ দিন পশ্চিমে ছিলে তাই হয়ত তোমার কাছে মানবিক দিকটা বড় করে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু ক'দিন বাদে তো তুমি থাকবে না। একদিন হয়ত বলল এ পুরনো জুতায় তার চলবে না, নতুন জুতা চাই, সাজার জন্য রুজ, লিপিস্টিক, পারফিউম চাই, আলু, কলা সিদ্ধ না মাছ মাংস চাই, তখন আমি কি পারব সেই আব্দার মেটাতে?

এতক্ষণ একটানা কথা বলার পর একটু থামে নূরজাহান।

X চাচী আপনি কি কংকনকে মেরেছেন?

X হ্যাঁ মেরেছি।

X কাজটা আপনি ভাল করেননি।

X হ্যাঁ জানি। কিন্তু এটা সাময়িক। তাই মন্দ কাজটা একসময় ভাল ফল দেবে। ওদেরকে আমি এখন থেকেই দুঃখ কষ্টে অভ্যস্ত করাতে চাই। এখন থেকে আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা অভ্যাস করলে, এক সময় যখন বড় বড় আঘাত আসবে তখন আর অসুবিধা হবে না। ক্রিং ক্রিং সদর দরজায় কলিং বেলের আওয়াজ আসে।

দরজা খুলে ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে যায় দ্রোহী। সামনে সেতারা বেগম দাঁড়িয়ে। অপ্রত্যাশিতভাবে সেতারা বেগম দ্রোহীকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে মরা কান্না জুড়ে দেয়। আমার নাহারকে এনে দে। বাবা তোর পায়ে ধরি। পায়ে পড়ি বলে ভদ্রমহিলা পায়ে ধরতে উদ্যত হয়।

X কি করেন কি করেন ফুপু। আগে ঘরে চলেন। সেতারা বেগমকে অনেকটা জোর করে ভেতরের দিকে নিয়ে যায় দ্রোহী। মাঝরাতে মরাকান্না শুনে বাড়ির সবাই জেগে উঠেছে। আশেপাশের বাড়ির সবার ঘরের লাইটগুলো একে একে জ্বলে উঠছে।

X সেতারা তোর কি হয়েছে খুলে বল। সালমা বেগম প্রশ্ন করে।

কোত্থেকে একটা তালপাতা এনে মেঘলা বাতাস করতে থাকে সেতারা বেগমকে। মায়ের আঁচল ধরে পিট পিট চোখে এই অভাবনীয় দৃশ্য উপভোগ করছে বুলেট। সালমা বেগম এবং মেঘলার বারংবার অনুরোধের মুখে সেতারা বেগম কখন হেচকি তুলে, কখনও ফুফিয়ে কাঁদে কখনও বা মরা কান্না কাঁদে, মোটের ওপর নাকের পানি চোখের পানি এক করে যে বক্তব্য রাখে তার অর্থ হচ্ছে, অনেকটা এরকম।

সকাল থেকেই নাহারের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এদিক ওদিক খোঁজাখুজি হচ্ছিল, এমতাবস্থায় বাড়িতে পুলিশ আসে। অভিযোগ মোতালেব চৌধুরীর বিরুদ্ধে চোরাকারবারির। হেরোইন চোরাকারবারী, যেনো তেনো ব্যাপার না। একদিকে স্বামীকে পুলিশ নিয়ে যায় আর একদিকে মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। একা মহিলা মানুষ কোথায় যায় কাকে ধরে। মেয়ের কথা অসম্পূর্ণ রেখে আবার স্বামীর কথায় ফিরে যায় সেতারা বেগম। লোকটা একেতো হার্টের রোগী তারপর আবার ডায়াবেটিস। কতবার সে স্বামীকে বলেছে দু'নম্বরি না করতে। আল্লাহ পাক তো আমাদের কম দেননি। আল্লাহপাকের অসীম মহিমা বর্ণনা করে পূনরায় কন্যা প্রসঙ্গে ফিরে আসেন মহিলা।

এ বান্ধবী ও বান্ধবীর কাছে ফোন করে অবশেষে চামেলী নাম্নী এক বান্ধবীর কাছে আসল তথ্য পাওয়া যায়। চামেলী যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পিএর মেয়ে একথাও বলতে ভুলে না সেতারা বেগম।

দ্রোহীর বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই। এই বিপদে সে তার একমাত্র কন্যাকে পাশে চায়। মেয়ে বড় হয়েছে, নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেছে, তাতে তার বা তার স্বামীর কোন আপত্তি নেই।

দ্রোহী বাপ আমার, আমার মেয়েকে এনে দে। ঘটনা বয়ানের ফাঁক ফোঁকরে এই মিনতি টুকু পূনরাবৃত্তি করতে থাকে সেতারা বেগম।

X তুই জানিস নাহার কোথায়? ছেলের চোখে চোখ রেখে আমেনা বেগম প্রশ্ন করে।

কি বলবে ভেবে পায় না দ্রোহী। তাই চুপচাপ থাকে।

কোথায় আছে তোর ফুপুকে বল।

X ওরা দাউদ কান্দিতে আছে।

X আমাকে এখন নিয়ে চল বাবা।

X এতরাতে আপনি কিভাবে যাবেন?

X তাহলে তুই যা।

X কালকে সকালে যাই।

X না। কালকে হরতাল যাওয়া যাবেনা। গেলে এখনই।

দ্রোহীর শত ওজর আপত্তিতে কান দেয় না সেতারা। বাধ্য হয়ে দ্রোহীকে রাস্তায় বের হতে হয়। উদ্দেশ্য সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল।

এতরাতেও সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে লোক সমাগম মন্দনা। এদিক ওদিক দাঙ্গা পুলিশ হেলমেট পরে আর হাতে ধাতব বর্ম নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। সন্ধ্যা থেকে এদিকটায় গন্ডগোল থাকায় লোকজন ঢাকা ত্যাগ করতে পারেনি। তাই হয়ত মাঝরাতে অনেকেই দেশের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে। কুমিল্লা অভিমুখি একটা বাসে উঠে পড়ে দ্রোহী। গাড়ীতে সর্বসাকুল্যে জনা পঁচিশ যাত্রী হবে। কাপড় চোপড়, হাতের ব্যাগ দেখে বোঝা যায় এরা বেশির ভাগই অফিস পাড়ার ছোটখাটো চাকুরে। হরতাল আসায় একটা দিন অতিরিক্ত বউ বাচ্চার সঙ্গে রাত যাপনের আনন্দে হয়ত অনেকেই বিভোর। কিন্তু দ্রোহী ভাবছে নব দম্পতির কথা। ওরা দুজন এখন স্বপ্নে বিভোর। ভবিষ্যতের স্বপ্ন, একপাল ছেলেপুলের স্বপ্ন, টুটি টাকি ঝগড়া, আঁদর, অভিমান অথবা ----

আচমকা কোত্থেকে একটা বড় ইটের টুকরা বাসের জানালার কাঁচকে চৌচির করে দ্রোহীর পেছনের সিটে বসা মধ্যবয়স্ক এক লোকের মাথায় আঘাত করে। শুধু একটা না পর পর ইট পাটকেল আসতে থাকে। মাথা নীচু করে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালায় সবাই। পেছনের লোকটা বাবা গো মাগো বলে কাঁদছে। একটা টিনের কৌটা পতনের শব্দ শুনতে পায় দ্রোহী এবং সেই সাথেই বিকট

আওয়াজে বিস্ফোরিত হয় বস্তুটি। শক্ত একটা ধাতব নাকি কাঁচ নাকি অন্যকিছু দ্রোহীর বা কাঁধের হাড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। যেন এক খন্ড আগুন দেহের ভেতর এই মাত্র প্রবেশ করল। তীব্র যন্ত্রণা, চিৎকার চেচামেচি, ধোঁয়া, চোখ খুলে রাখতে পারছে না দ্রোহী। অনেক যন্ত্রনা হচ্ছে মেরুদন্ড সহ সারা পিঠে, মাথায়, পায়ে। আজরাইলের নিশ্চিত পদধ্বনি শুনতে পায় সে। অনেক কষ্টে চোখ মেলে আজরাইলকে চোখের দেখা দেখতে চেষ্টা করে দ্রোহী। কয়েক হাত দূরেই পাঁচটা অক্ষত আংগুল সহ কোন যাত্রীর হাতের খন্ডাংশ। আজরাইলকে দেখার আশা ছেড়ে দেয় পরমুহূর্তে। চোখ বুজে আসছে। পৃথিবী থেকে সমস্ত আলো ক্রমান্বয়ে ম্লান থেকে ম্লানতর হচ্ছে। অন্ধকার, অন্ধকার, ঘুট ঘুটে অন্ধকার।

॥ সতের ॥

ষড় ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। প্রতিটি ঋতুই তার নিজ নিজ মহিমায় সমৃদ্ধ। গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবানল অথবা আম্রমুকুল আর বৈশাখী ঝড়। বর্ষার অবিরাম ক্রন্দন। শরতের কাশফুল। হেমন্তের ধান কাটা। পৌষ মাঘের হাড় কাঁপানো শীত, ঘরে পিঠা তৈরীর পর্ব আর ফুলে ফুলে, পাখীর কূজনে মুখরিত বসন্ত। সবগুলো ঋতুর আগমনী বার্তা অথবা আপন মহিমা সমূহ দ্রোহীর দৃষ্টিতে কখনই ধরা পরেনি। ছয় ঋতুর দেশ বাংলাদেশ, একথা শুধুই হরলাল রায়ের বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা বইতে সীমাবদ্ধ ছিল। বড় জোর তিনটি ঋতুর অস্তিত্ব সে আজীবন টের পেয়েছে। শীত, গরম আর বর্ষা। বাংলাদেশে এসেছে সে শীতে। কিন্তু সত্যিকারের শীত হাতে গোনা মাত্র ক'দিন অনুভব করা গ্যাছে। হাড় কাঁপনো তো দূরের কথা পশমে কাঁপন ধরতে না ধরতেই গরম অনুভব হওয়া শুরু হয়ে গেছিল। শীতের পর যে বসন্ত নামের একটা ঋতু আছে তা বোধেই ছিল না। আর তা আদৌ অনুভূত হত না যদি না সে শন্তিনগরের এই ক্লিনিকের দোতলার এই কেবিনে শয্যাশায়ী হতো।

দ্রোহী যে কেবিনে আছে সেটি ক্লিনিকের একেবারে শেষের দিকে। এই কেবিনের পরেই সামান্য এক খন্ড জংগলে ভরা জায়গা। জায়গাটুকুকে একটু আঁদর যত্ন করলে সুন্দর একটা বাগান হতো। কিন্তু ক্লিনিকের মালিক ভদ্রলোক ইচ্ছাকৃত হোক আর অনিচ্ছাকৃত হোক পরিকল্পিত কোন বাগান এখানে করেনি। বরং এখানকার ঝোঁপ ঝাড় গুলো জংলিভাবে অযত্নে বেড়ে উঠেছে। বেশ কিছু জংলী ফুলও ফুটে আছে এদিক ওদিক। প্রতি সন্ধ্যায় এক ঝাঁক পাখী কোত্থেকে যেন আসে। এসেই কিচির মিচির, ক্যাউ ক্যাউ জংলী গাছ গুলোর ডালে, কার্নিশে জানালায় সবখানেই কিচির মিচির। অসহ্য রকমের ভাল লাগা। বিক্ষিপ্তভাবে ফুটে থাকা নাম না জানা জংলী ফুল, অযত্নে বড় হওয়া বৃক্ষরাজীর সবুজ পাতা, ডানায় রঙিন পরাগ রেণু মেখে একুল ওকুল উড়ে বেড়ানো প্রজাপতি, পক্ষীকুলের কিচির মিচির, জানালা দিয়ে বয়ে যাওয়া দখিনা হাওয়া এসব কিছু মিলেই আরেকটা বসন্ত উপভোগ করার সুযোগ আল্লাহ্ পাক তাকে শেষ পর্যন্ত বরাদ্দ করে দিয়েছে।

আজরাইল সাহেব এবারেও আশপাশের ঘাস মাড়িয়ে গ্যাছে। বাম কাঁথে, কানের লতিতে আর পায়ে হাঁটুর ঠিক নীচে জখম হওয়া ছাড়া তেমন কোন বিপত্তি হয়নি। রক্ত ক্ষরণ অবশ্য প্রচুর হয়েছে। হাসপাতালে যখন জ্ঞান ফিরে পায় দ্রোহী তখন তার চারপাশে বাড়ির প্রায় সবাইকে দেখতে পেয়েছিল। এত তাড়াতাড়ি এরা খবর পেলো কিভাবে? পরে অবশ্য সব শুনে বন্ধু স্যামকে মনে মনে একটা ধন্যবাদ জানায় দ্রোহী। আসার আগে স্যাম বলেদিয়েছিল, দোস্ত বাংলাদেশের যা অবস্থা পকেটে সবসময় নিজের নাম ঠিকানা, সোজা কথা মরলে যাতে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের গিনিপিস না হতে হয় সেই জন্য এই ব্যবস্থাপত্র।

মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ডাক্তাররা ওয়ালেট হাতড়িয়ে নাম ঠিকানা পেয়ে প্রথমে বাসায় ফোন করে। বাসার মানুষ ঐ সময়ে আসতে পারেনি কিন্তু ধ্রুবর দু'সপ্তাহ ধরে রাতে ডিউটি। তাকে ফোন করে জানাতেই পিজি থেকে ---- কয়েক মিনিটের ব্যাপার।

যেখানে যে কটা সেলাই দরকার তা ইমার্জেন্সিতেই সারা হয়। ডি এম সিতে দু'দিন থাকার পর; আরও কিছুদিন ফুল বিশ্রামে থাকার জন্য দ্রোহীকে শান্তি নগরের এই ক্লিনিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ক্লিনিকের নামে আবিসিনিয়া বা আবেহায়াত এই টাইপের আরবী সারবী গন্ধ আছে। ক্লিনিকের মালিক ভদ্রলোক হয়ত জামাতের লোক। তা হোক, যাহাই আরবী তাহাই বি এন পি।

একদিন ক্লিনিকে থাকার আরেকটা উপকার হয়েছে, তা হচেছ প্রচুর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। অনেকের সঙ্গে ইচ্ছা থাকলেই দেখা করা হয়ে ওঠেনি। একদিন ক্লিনিকে একে একে সবাই এসেছে। টু ইন ওয়ান। বোমাবাজ বেচারাকে পেলে দশটা ডলার বখশিশ দিত দ্রোহী।

হাবিব বর্তামানে বনানীতে শ্বশুরালয়ে আশ্রয় নিয়েছে। যদিও অনেকটা বাধ্য হয়ে বেচারা এই ব্যবস্থায় রাজী হয়েছে। মোতালেব ফুপার বিচার কাজ এখনও শুরু হয়নি ডিটেনশনে আছে মুহূর্তে সেতারা ফুপুর একজন সার্বক্ষণিক সঙ্গী সত্যিই প্রয়োজন। হাবিব অথবা নাহার দুজনের একজন অন্ততঃ একবার করে ক্লিনিকে ঢু মেরে যায়। কোথা থেকে যেন ফারুক, ন্যাংটা ফারুক খবর পেয়ে একদিন ক্লিনিকে হাজির। ফারুকের আচমকা পরিদর্শনে ক্লিনিকের ডাক্তার থেকে শুরু করে জমাদার পর্যন্ত সবাই বোকা দ্রোহীকে সমীহ করে চলে।

আবুল কালাম প্রতিদিন অন্ততঃ একবার কোন কোন দিন দু'বারও হানা দেয়। হাসেম চৌধুরী তার ডাক্তার মেয়ে নয় মেঝো মেয়ে নর্থসাউথ বি বি এর জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। এখন দ্রোহী রাজি হলেই হলো।

খুব সকালে দ্রোহীর জানালার পাশদিয়ে তর তর করে বেড়ে ওঠা নাম না জানা মগডালে বসে নিঃসঙ্গ একাকি একটা কোকিল কুহু কুহু ডেকে যায়। কোকিল বেচারা প্রিয়জন হারানোর বেদনায় কাঁদে? নাকি একাকিত্ব দূর করবার উদ্দেশ্যে কাংখিত কোন সঙ্গিনীকে উদ্দেশ্য করে প্রেম নিবেদন করে আপন মনে গেয়ে যায় তা দ্রোহীর জানার অসাধ্য।

ইবযধারড়ৎধষ ঝপরবহপব-এ কোকিলের গান সম্পর্কে কেউ গবেষণা করেছে কিনা দ্রোহীর জানা নেই, করলে চমৎকার একটা বিষয়বস্তু হতো। কোকিলের গানের ওপর গবেষণা করার কোন ইচ্ছা দ্রোহীর নেই। কিন্তু কাক ডাকা ভোরে কোকিলের ডাক শুনে ঘুমটা যখন ভাঙ্গে তার তখন আসছে দিনটাকে খু-উব প্রাণবন্ত মনে হয়। কোকিল বিদায় নেবার পর পরই অল্প বয়স্ক একজন সেবিকা আসে। হাতে দু'কাপ চা। নিজের জন্য একটা দ্রোহীর জন্য বাকীটা। মেয়েটার নাম সাহারা বেগম। চেহারা সুরত সুবিধার না। কিন্তু কথাবার্তায় মাশাল্লা। সুন্দরবনের এক নম্বর মধু মাখানো আছে প্রতিটি কথায়। মহিলার সঙ্গে ভাল ভাব হয়ে গ্যাছে দ্রোহীর। অন্য রোগীরা তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। রোগীরা ঘুম থেকে উঠলেই তাদের ওষুধপত্র, জ্বর মাপা, প্রেসার মাপা আরও কতকি। তাই ওই সুযোগে মহিলা দ্রোহীর সাথে বসে গল্প করে কাটায়।

মেয়েটা তার পরিবারের কথা বলে। ছোট ভাই বোনের কথা বলে। তার প্রেমিকের কথা বলে। প্রেমিক যুবক জীবিকার সন্ধানে মালয়েশিয়া গ্যাছে বছর তিনেক হলো। প্রথম দু'বছর কোন খোঁজ-খবর ছিল না। গত একবছর হলো ছেলেটা যোগাযোগ করছে। মালয়েশিয়া যাওয়ার ক'দিন বাদেই জেলে নিয়ে যায়। দু'বছর বিনা বিচারে আটকা ছিল। পরে কোন এক মানবাধিকার সংস্থা সাহায্যে সরকারি মেহমান খানা থেকে মুক্তি পেয়েছে। আর মাস কয়েক কাজ করলে আর্থিক অসংগতি কিছুটা হলেও পুষিয়ে নেওয়া যাবে, এই উদ্দেশ্যেই এখনও মালয়েশিয়ার মাটি আঁকড়ে ধরে আছে।

লোকমান দেশে আসলেই সাহারা ঘর বাঁধবে। যা হোক ডাল ভাত একটু কিছু জুটেই যাবে। অপেক্ষায় আছে সাহারা। মেয়েটার এই অপেক্ষার জীবন খানিক জ্বালাময়ী হলেও কোথায় যেন একটু ভাল লাগাও লুকিয়ে আছে। কিন্তু এই অপেক্ষার জীবনের আগে আরেকটা ঘটনা ঘটে গ্যাছে মেয়েটার জীবনে। দুঃস্বপ্নের মত লাগে সাহারার কাছে সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে।

তখন ক্লাশ টেনে পড়ে সাহারা। খুলনা শহরে অল্প বেতনের ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর কাজ করত ওর বাবা। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন মারা গেল ভদ্রলোক। সাহারার মা অশিক্ষিতা এক মহিলা। তিন নাবালক সন্তান নিয়ে সে তখন দিশেহারা। এই দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়ায় সাহারার দূর সম্পর্কেও এক ফুপু। থাকে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে। সাহারার বিয়ে ঠিক করেছে এক ব্যবসায়ী ছেলের সাথে। হাফ ছেড়ে বাঁচে মহিলা।

এক বুক স্বপ্ন নয়ে সাহারা যায় স্বামীর ঘরে। কিন্তু ঘর ভাংতে তার দেরী হয় না। স্বামী হিসেবে যার সঙ্গে সে কবুল বলেছে, তার এ ধরনের স্ত্রীর সংখ্যা আরও অনেক। এদের সবাইকে দিয়ে সে দেহ ব্যবসা করায়। সাহারার ওপর চাপ আসতে থাকল। শারীরিক নির্যাতনও দিন দিন বাড়তে থাকল। কোন এক প্রত্যুষে উপরওয়ালার ওপর ভরসা করে উত্তরার সেই জেলখানা থেকে পালায় সাহারা। পালিয়ে সোজা খুলনায়।

বছর খানেক ধরে লোকটা নানান ফন্দিফিকির করে সাহারাকে ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু সাহারার মনবলের কারণে পারেনি। দুঃসময় মানুষকে সাহসী করে তোলে। ইতিমধ্যে সাহারা জেনে গ্যাছে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয়।

সাহারা বেগমের সাত কাহন শুনতে শুনতে পূব আকাশে সূর্য উঁকি মারে। বিদায় নেয় মেয়েটা। খানিক বাদেই আসে পুতুল কলেজে যাওয়ার পথে নাস্তা নিয়ে। যদিও ক্লিনিক থেকে যথেষ্ট ভাল নাস্তা দেওয়া হয় তবু লিপি ভাইর জন্য নাস্তা পাঠাবে। সাহারার অনেকগুলো ভাল গুনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বই পড়ার অভ্যাস। এই ক্লিনিকেই ওর একটা ছোট খাটো লাইব্রেরীর মত আছে প্রেম চাঁদ মুন্সীর কেরু সাহেবের মুন্সী বইখানা দ্রোহী নিয়ে রেখেছে। এখনও পড়া হয়নি।

পুতুল আসার পর পরই আসে একজন চ্যাংড়া মত ডাক্তার, বোধ হয় সদ্য পাস করেছে। বার বার বেশ নার্ভাস ভঙ্গিতে এই কেবিনে আসে। দ্রোহীর ফাইলটা নিয়ে সে বিজ্ঞের মত নাড়াচাড়া করে। রোগীর চাইতে রোগির পাশে বসা মানুষটির দৃষ্টি আকর্ষণই যে এখানে মুখ্য তা বুঝতে কষ্ট হয় না দ্রোহীর।

পুতুল চলে যাবার খানিক পর বাসা থেকে কেউ না কেউ আসে। আর তার সাথে আসে কংকন। এই ক্লিনিকে কংকনের বেশ চাহিদা? আশেপাশের কেবিনের দু'একজন বয়স্ক রোগীও এসময় দ্রোহীর কেবিনে চলে আসে। মুগ্ধ শ্রোতা পেয়ে কংকন আপন মনে গান করে। কখনও লালনগীতি কখনও নজরুল গীতি আবার কখনও হাসন রাজার গান।

দুপুরের দিকে কংকন অন্য কারও সাথে পিজিতে চলে যায় তার বাবার কাছে।

এরপর খানিক বিরতির পরই আত্নীয় স্বজন আসতে থাকে। ধীরে ধীরে দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধা। পাখীর কিচির মিচির, দখিনা হাওয়া, ডাক্তার, নার্স, থার্মোমিটার, ওষুধ পত্র। সন্ধ্যা একসময় রাত, রাত এক সময় গভীর রাত হয়। চারিদিক নীরব হতে থাকে। এ সময়টা একজনের কথা খুব মনে পড়ে দ্রোহীর। বালিশের নীচে রাখা গল্পের বইর পাতায় আনমনে চোখ বুলিয়ে যায় সে কখনও কখনও। গল্পের বইগুলো সাহারার কাছ থেকে ধার করা। মেয়েটার অনেকগুলো ভাল অভ্যাসের মধ্যে একটি হচ্ছে বই পড়ার অভ্যেস। অনেক দুর্লভ বইও ওর সংগ্রহে আছে। প্রেম চাঁদ মুন্সীর কেরু সাহেবের বইখানা গতকাল রাতে নিয়েছে দ্রোহী। পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি সে।

প্রতিদিনের মত খুব সকালে ঘুম ভাঙ্গে দ্রোহীর। কান দুটো উৎকর্ণ হয়ে থাকে কোকিলের বিরহী কুহু শোনার জন্য। কিন্তু কোকিলটা আজকে মনে হয় ধারে কাছে কোথাও নেই।

সাহারার আজকে অফ ডে। প্রত্যুষটা তাই একাকী কেটে যায়। যথা সময়ে পুতুল আসে। হলুদ রঙ্গের শাড়ি আর খোপায় বেলী ফুলের মালা জড়িয়ে খুব সুন্দর করে সেজেছে পুতুল।

X হলুদ শাড়ি পরে এত সেজে গুজে কলেজে যাচ্ছিস নাকি?

X বারে --- আজকে

কিছু একটা বলতে যায় পুতুল, কিন্তু ইতিমধ্যে যুবক ডাক্তার যথারীতি নার্ভাস ভঙ্গিতে ঘরে ঢোকে। হাতে একটা থার্মোমিটার। পুতুলের দিকে তাকিয়ে বেডের কাছে আসার সময় সামনে রাখা

চেয়ারটাতে হোচট খেয়ে চিৎপটাং দেয়ার পূর্ব মুহূর্তে নিজেকে রক্ষা করে। কিন্তু হাতের থার্মোমিটার রক্ষা করা যায় না। মেঝেতে পড়ে কয়েক টুকরো হয়ে যায় তাপমাত্রা মাপার যন্ত্রটি। পুতুলের দিকে তাকিয়ে এবার সরি বলে যুবকটি। তারপর আবারও নার্ভাস ভঙ্গিতে বাইরে চলে যায়। বোধকরি, ---- আর --- আনতে গ্যাছে।

ডাক্তার চলে গেলে মামা ভাগ্নি দুজনেই হেসে ওঠে। হ্যারে পুতুল এই ডাক্তারটা সবসময় এত নার্ভাস থাকে ক্যান বলত।

কি জানি? নার্ভাস সিস্টেমে কোন গোলমাল আছে মনে হয়। --- মামা তোমার চোখ এত লাল কেন রাতে ঘুমাওনি।

X অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বই পড়েছি। আবার সকালে ঘুম ভেঙ্গে গ্যাছে। মাথাটা ধরেছে খুব।

X তুমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাক। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

পুতুল খুব যত্ন করে দ্রোহীর কপাল টিপে দেয়। বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। এক সময় পুতুলের হাত থেমে যায়।

X কিরে থামলি কেন?

X মামা দেখো না কে যেন এসেছে।

পুতুলের দৃষ্টি অনুসরণ করে দরজার দিকে তাকায় দ্রোহী। প্রবেশ পথে দাঁড়ানো এ নারী মূর্তি, জীবন্ত। দু'হাতে এক গোছা করে রেশমী চুড়ি, পরনে লাল পেড়ে হলুদ শাড়ি ঠোঁটে গালে কোন রং নেই তবে কপালে সূর্যরঙা টিপ। টিপের ঠিক নীচে টিকালো -- --- ---- শিশির বিন্দুর মত কয়েক ফোটা ঘামের অস্তিত্ব। মায়া মৃগের মত এক জোড়া কালো চোখ, কাজল পরা। সেই চোখে কিঞ্চিৎ দুষ্টমির ছাপ। মুখ টেপা হাসিতে সেই দুষ্টুমির যদিও প্রকাশ।

X ক্যামন আছেন?

X দরজায় দাঁড়িয়ে না থেকে ভেতরে আস।

একটু ইতস্ততঃ করে বর্ষা পুতুলের দিকে তাকিয়ে।

X নির্দ্বিধায় আসতে পারো। ও হচ্ছে পুতুল। আমার অনেক অনেক আঁদরের ---

X বর্ষার ইতস্ততঃ ভাবের কারণটা স্পষ্ট হয় এবারে। মেয়েটার দুহাত লুকোনো ছিল পেছনে পর্দার আড়ালে। এবারে সেই হাত দুটো সামনে চলে আসে। বর্ষার হাতে স্বচ্ছ পলিথিনে মোড়ানো ফুলের তোড়া।

পুতুল উঠে দাঁড়ায়।

বাহ তাহলে তো আমার ছুটি। আমার বন্ধুরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

মামী, রোগী তোমার দায়িত্বে রইল, আচ্ছা?

আমি চললাম।

দরজার কাছে থেকে আবার ফিরে আসে পুতুল। মামী, শোন। বর্ষার কানে কানে বা চুপি চুপি কিছু বলতে উদ্যত হয় পুতুল। কিন্তু বর্ষার খুব কাছে এসে বেশ জোরে বলে

X তুমি এত্ত সুন্দর ক্যানো গো মামী। হ্যাঁ?

বিনা বাক্যে লজ্জা মাখা আরক্ত হাসি দিয়ে পুতুলের প্রশংসার উত্তর দেয় বর্ষা।

পুতুল বিদায় নেবার পর দ্রোহী মুখ খোলে আবার।

X ব্যাপারটা কি বলতো?

X ব্যাপার কি মানে?

এই যে সাত সকালে হলুদিয়া মত সাজ। তাও দুই রমনীরই এক রকম বেশ- ভূষা।

X বা রে আজকে পহেলা বৈশাখ না?

X হু।

ও তাইতো কোকিল ভাইজান ----।

X কি বলছেন বির বির করে?

X কি বলছি শুনবে?

X তোমাকে ভীষণ সুন্দর লাগছে।

X মিথ্যে কথা। আমি সুন্দর হলেতো লাগবে।

X তুমি সুন্দরও যদি নাহি হও তাই বলো কি বা যায় আসে প্রিয়ার কি রূপ সেই ---- ওগো যে কখনও ভালবাসে।

বেসুরো গলায় গান গেয়ে ওঠে দ্রোহী।

X কি? তার মানে আমি সুন্দর না? কপট রাগ না গোস্বা হয়ে প্রতিউত্তর করে বর্ষা।

হো হো হো। আচ্ছা ঠিক আছে তুমিই বলে দাও কি বললে তুমি খুশি হবে?

X থাক আমাকে আর খুশি করতে হবে না। হাসপাতাল থেকে ছাড়বে কবে?

X বলছি। আগে কাছে, মানে এইখানে, আমার শিয়রের কাছে এসে বোসো। সিনেমার নায়িকারা যেমন করে বসে।

X আমি আর বসতে পারছি না। রমনায় যাবো বেরিয়েছি। সময় আর বেশি নেই।

X তুমি জানলে কিভাবে যে আমি হাসপাতালে।

X আপনাদের বাসায় ফোন করেছিলাম কালকে। ভাবী বলল। খুব বেশী আঘাত পেয়েছেন?

X হুম খুউ-ব। সেই আঘাতের জের কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত ছিল। এখন আর নেই একটুকুও। আমার ভীষণ রমনায় যেতে মন চাইছে। আমাকে নিয়ে যাবে?

X মাথা খারাপ হয়েছে?

X হ্যাঁ অনেকটা তাই। তুমি এক কাজ কর। ডাক্তারদের রুমে গিয়ে দেখবে --- বেশ হ্যান্ডসাম একজন ডাক্তার নাম মাহতাব। তাকে একটু ডেকে নিয়ে আস চষবধংব.

মিনিট দুই পরে মাহতাব বর্ষার পেছন পেছন কেবিনে ঢোকে। হাতে ডাষ্ট প্যান আর ম্যাজিক ব্রুম।

ঘরে ঢুকেই থার্মোমিটারের গুড়ো কাঁচ পরিস্কার করতে উদ্যত হয় মাহতাব।

বাঁধা দেয় দ্রোহী।

ডাক্তার সাহেব। এগুলো পরে পরিস্কার করবেন। এবার বলেন তো আমাকে কবে ছাড়া হবে?

X স্ত্রী আজকেও হতে পারে আবার কালকে হতে পারে। নির্ভর করছে স্যার কখন আসেন।

X আপনাদের স্যার আজকে আসবেন না।

বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে রমনা বটমূলে গ্যাছেন।

আমি দশ বছর হয় বৈশাখী মেলা দেখিনি। আপনিকি শরহফষু একটা ব্যবস্থা করবেন?

- আমতা আমতা করে যুবকটি ইয়ে মানে।

X মানে টানে বুঝিনা। আমি এখন যাচ্ছি। বিকেলের মধ্যে ফিরে আসব প্রমিস।

পুরোনো সূর্যটার এখন আর আকাশে দৃশ্যমান নেই। নতুন বছরের নতুন সূর্যটার আগের চেয়ে অনেক তেজদীপ্ত ভাব।

শান্তিনগর মোড়ে এসে রিক্সা নিতে চায় দ্রোহী। কিন্তু আপত্তি জানায় বর্ষা।

X এর চাইতে বরং হাঁটা যাক।

X তবে তাই হোক।

এ পথ ওপথ করে ওরা একসময় বাংলা একাডেমীর সামনে আসে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে দুজনেই। চারিদিকে লাল পেড়ে অথবা হলুদ শাড়ি পরিহিতা রমনীর ----। কপালে সূর্যরঙা টিপ একা বা জোড়া কেউ বা বন্ধুদের সাথে কেউবা মা বাবার সাথে। দূর থেকে ভেসে আসছে বটমূলের ---। হৈ হুল্লা কিচির মিচির।

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা দুজন। দ্রোহীর হাতে ধরা বর্ষার হাত। মৃদু বাতাস বইছে এই মুহূর্তে। সেই বাতাসে বর্ষার শরীরের মিষ্টি গন্ধ পুষ্প রেণুর মত দ্রোহীর নাকে মুখে লেপটে দেয়।

আকাশের ঝলমলে ভাবটা এখন আর নেই। ঈষাণ কোণে মেঘ জমেছে। ঝড়ের পূর্বাভাস। বাংলা একাডেমি, বটমূল, শিশু একাডেমি হয়ে ওরা যখন শাহবাগের মোড়ে এসে পৌঁছে তখন গুমোট অথচ শান্ত প্রকৃতি হঠাৎই অশান্ত হয়ে যায়। নীলিমায় নীল রঙা মেঘ গুলো পোড়া কাঠের বর্ণ ধরে উগ্র মূর্তি নিয়ে এগিয়ে আসে অশান্ত প্রকৃতি। দশদিক থেকে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে বাতাসেরা ঢাকার রাজপথগুলোতে তান্ডব শুরু করে দেয়। সেই তান্ডবের ঘূর্ণাবর্তে ধুলো বালি, খড়-কুটো, পথে পড়ে থাকা কাগজের টুকরো নেচে নেচে বেড়ায়। আত্মরক্ষার জন্য ওরা দু'জন দৌঁড়ে যাদুঘর অঙ্গনে প্রবেশ করে। লোকজনের ভীষণ ভিড় এড়িয়ে এক কোনা বেছে নেয় ওরা। শত ভিড়ের মাঝেও নিজেদেরকে একটু আড়াল করে রাখা। পাশাপাশি বসে আছে দুজন। ------ বাতাসের তান্ডব যাদুঘরের বিশাল চওড়া স্তম্ভে বাঁধা পেয়ে এদিক ওদিক বয়ে যায়, আঘাত করতে পারে না তাদের। খানিক ছুঁয়ে যায় মাত্র। হাঁটুর ওপর থুতনি বর্ষার, একহাতে কাঠি দিয়ে কি যেন আঁকিঝুকি করে মেঝেতে। অন্য হাতে মাঝে মাঝে কপাল আর মুখে ঝুঁকে আসা অবাধ্য চুল সরানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে।

বর্ষা?

X উম? চোখ তুলে তাকায় বর্ষা, সরাসরি দ্রোহীর চোখের দিকে। তাকিয়েই থাকে। অনেকক্ষণ প্রশ্নের বাকী অংশটুকু শোনার অপেক্ষায়।

কিন্তু কোন প্রশ্ন করে না দ্রোহী। মিষ্টি করে হাসে শুধু একটু। তারপর সংকুচিত দুহাত প্রসারিত করে দেয়। কি এক দুর্নিবার আকর্ষণ। যেন এক বিশাল চৌম্বক ক্ষেত্র। যার ক্ষমতা মহাবিশ্বের যে কোন চৌম্বক ক্ষেত্রের চেয়ে কয়েক হাজার গুন বেশি। এড়াতে পারে না বর্ষা সেই আকর্ষণ শক্তিকে। ধীরে ধীরে কাছে আসে একেবারে কাছে। দ্রোহীর প্রসস্ত বুকে আলতো করে মাথা রাখে। কান পেতে শুনতে চায় বর্ষা দ্রোহীর হৃৎপিন্ডের প্রতিটি সংকোচন প্রসারণের শব্দ। ঝড় ঝড় কালবৈশাখী ঝড়।

॥ আঠার ॥

ঘুমিয়ে আছে ফেরদৌস চাচা। সাদা চাদরে ঢাকা। কংকালসার শরীর আদৌ কোন প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তা বোঝা যায় না। মৃদু নাক ডাকার শব্দ না শোনা গেলে বোঝার উপায় নেই বেঁচে আছে না মরে গ্যাছে। সীমাহীন চলার পথে সাময়িক যাত্রা বিরতি। সে বিরতি প্রায় শেষ। অনন্ত যাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন বাঁশির আওয়াজ শোনার প্রতীক্ষা মাত্র।

সবদিন এত যন্ত্রণাহীন কাটে না ফেরদৌস চাচার। যেদিন গোসল করে সেদিন সামান্য কিছুক্ষণের জন্য হলেও ছটফট কম করে। স্বামীকে গোসল করিয়ে দুপুরের খাবার খাইয়ে আধঘন্টার মত হলো নূরজাহান বাসায় গ্যাছে। সাধারণতঃ রাত দশটার আগে মহিলা হাসপাতাল ত্যাগ করে না। আজকেও যেতে চায়নি কিন্তু একরকম জোর করেই রিক্সায় উঠিয়ে দেয় দ্রোহী।

এই কেবিনে আরেকজন রুগী ছিল গতকাল দুটি হয়েছে। এই বিকেলেও তাই দর্শনার্থীর ভির নেই। ফেরদৌস চাচার শিয়রের কাছে একটা চেয়ার টেনে বসে আছে দ্রোহী। সেই কুড়ি বছর নাকি তারও আগের কথা। কতক স্পষ্ট কতক আবছা মনে পড়ে দ্রোহীর।

টাঙ্গাইল শহর থেকে ত্রিশ মাইল দক্ষিণে পুরনো ব্রহ্মপুত্রের গাঁ ঘেঁষে একটা গ্রাম, সলিমাবাদ। শুধু টাঙ্গাইল শহর থেকেই সলিমাবাদ যেতে টেম্পু অথবা মুড়ির টিন, নৌকা, বালুচরে হাঁটা, রিক্সা আবার হাঁটা সব মিলিয়ে সাত আট ঘন্টার ধাক্কা। সময় ক্ষণ হিসাব করলে সলিমাবাদ গ্রামকে অজ পাড়াগাই বলা চলে। কিন্তু স্কুল কলেজগামী ছাত্রছাত্রীদের হার অথবা শহর অভিমুখী চাকুরী বা ব্যবসায়ীর সংখ্যা হিসাব করলে এই গ্রামকে অজ পাড়া গা বলা যায় না মোটেই।

পুরনো ব্রহ্মপুত্রের গা ঘেঁষে ঠিক মাঝ গ্রামে দুই খানা চার চালা টিনের ঘর, রান্না, গোয়াল আর বাংলা ঘর সহ আরও গোটা চারেক ছনের ঘর নিয়ে আজিজুল মুন্সীর গৃহস্থ বাড়ি। বাড়ির আশে পাশে তেমন জমিজমা না থাকলেও নদীর গর্ভ আর নদীর ওপারে চরের ধানি জমি মিলে বিঘা দশেক জমির মালিক আজিজুল মুন্সী। নয় মাস হাল চাষ আর বর্ষার তিন মাস চালের ব্যবসা, এই নিয়ে ভালই চলে যায় মুন্সীর।

স্ত্রী গত হয়েছে বছর পাঁচেক আগে। কলেরায়। স্ত্রী মারা যাবার পর পাড়া পড়শী আত্মীয় স্বজনের চাপাচাপির পরও দ্বিতীয় বার পতি গ্রহণ করেনি আজিজুল মুন্সী। স্ত্রীকে বড় বেশী মহব্বত

করত মুন্সী। তাই মারা যাবার পর মোহাব্বতের মানুষটির রেখে যাওয়া স্মৃতি এক মাত্র সন্তান পুত্র সন্তান ফেরদৌস মুন্সীকে বড় করাই তার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেটার পড়াশোনায় মন নাই মোটেই। এই বার নিয়ে তিন তিন বার মেট্রিক দিল কিন্তু পাসের দেখা নেই। পড়া লেখায় মন না থাকলেও চলে, কিন্তু ছেলেটার বিষয়জ্ঞান একেবারেই নেই। আজিজুল মুন্সীর ভাবনা এখন এই পাগল ছেলেটাকে নিয়ে। নিজে যতদিন আছে ততদিন অসুবিধা নেই। কিন্তু চোখ বুজলেই চিল শকুনের ছেলেটার মাথা খুলে ----- যাবে আত্নীয় স্বজন আর পাড়া প্রতিবেশী।

ছেলেকে ছোট বেলা থেকেই শাসন করে মুন্সী এমনকি শরীরে পর্যন্ত হাত তুলতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু এখনতো ছেলে জোয়ান হয়েছে। কত আর শাসন করা যায়।

ফেরদৌসের পারিবারিক পদবী মুন্সী হলেও সেদিক কেউ খুব একটা মাড়ায় না। পাড়া প্রতিবেশি বন্ধুবান্ধব সবাই বলে ফেরদৌস পাগলা। যে যা বলে তাই শোনে ফেরদৌস পাগলা। ওমুকে হয়ত বলল চলো ফেরদৌস সমিতি করি। ব্যাস লেগে গেল ফেরদৌস পকেটের পয়সা, নিজের সময়, ধ্যান ধারণা সব সমিতি কেন্দ্রীক। মাস কয়েক চলার পর সমিতি হয়ত হোচট খেলো অর্থ আত্নসাতের কারণে। যারা অর্থ হাপিস করল তারা ধরা ছোঁয়ার বাইরে কিন্তু ফেরদৌস পড়ল ফাঁদে। ছয় মাসের অর্জিত সফলতা ছয় দিনেই ভূপাতিত। চুরি, সাংগঠনিক অদক্ষতার অভিযোগ মেলা। সঙ্গে হয় কিল ঘুষি চড়, থাপ্পড়। দিন কতকের বিরতি। বর্ষায় মেঘের ঘনঘটা, নদীতে জোয়ার, অথৈ পানি চারিদিকে। এমন বর্ষায় নৌকা বাইচ না হলে বর্ষার সম্মান থাকে কোথায়? তো নাও বাইচের আয়োজনটা করবেটা কে? ফেরদৌস পাগলা। পাশের তেবাড়িয়া অথবা গয়হাটার ফুটবল টিম গেল বার তিন গোল দিয়ে গেল। ফেরদৌসের দলের হারার কথা ছিল না। কিন্তু বুটের সামনে কি আর খালি পায়ে যুদ্ধ করা যায়। এবার তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে হবে। কিন্তু জবাব দিতে হলে চাই এগারো জোড়া বুট। দলের জারসিরও যায় যায় দিন অবস্থা, শিয়াল কোটের ফুটবল না হলে কি আর লাথি দিয়ে জুইত আছে? এসবের জন্য চাই অর্থ কড়ি। অর্থ ওয়ালা মানুষের অভাব নেই এই গ্রামে। খালি রোজার ঈদে অথবা বকরি ঈদে পড়তামত দাবী উপস্থাপন করা। করবেটা কে খেলার মাঠে ব্যাগি থাকবে কে? ফেরদৌস। বল না রাখতে পারলে ঠ্যাং। মাইল খানেক দূর থেকে ষাড়ের মত ছুটে আসে ফেরদৌস, প্রতিপক্ষের স্ট্রাইকার ডিবক্সে ঢোকে সাধ্য কি?

তবুও হয়ত শেষ রক্ষা হয় না। দোষ কার? ফেরদৌসের? দমার পাত্র নয় ফেরদৌস। মান্নাফ চেয়ারম্যানের ছাতা মার্কার ইলেকশন। ছাতা হাতে মিছিলের আগে কে? ফেরদৌস। জুম্মা ঘরের চাল ঝড়ে ভেঙ্গে গ্যাছে, নামদার খার বাড়ির সামনের বাঁশের পুলটা এখনও মেরামত হয়নি। হবেও না। যতক্ষণ না ফেরদৌস দায়িত্ব নেয়। শরিক বাড়ির বড় বউর দুধের বাচ্চা, দুই সপ্তাহ যাবত টাইফয়েড নাকি গুটি বসন্তে নাকি কামালায় ভুগছে। থানা হাসপাতালে নিতে হলে ফেরদৌস ছাড়া উপায় নেই।

আত্নীয় স্বজন বা পাড়া প্রতিবেশীর বিয়ে? কোন অসুবিধা নেই। গেট সাজানো থেকে শুরু করে নায়োর পর্যন্ত যত পরিশ্রমের কাজ তা ফেরদৌসের। ফেরদৌস পাগলা যে কাজটা অতি দক্ষতার সাথে করতে পারত তা হলো গোর খোদা। তবে কবরে লাশ নামানোর কাজটা সে কখনও করত না ভয়ে। একবার লাশ নামাতে গিয়ে মাদ্রাসার বড় মওলানার ধমক খেয়েছিল।

X মিয়া কি কর? দোয়া দরূদ জানো না, পাক কি না পাক লাশ কবরে নামাইতে যাও তুমি কোন সাহসে। ফেরেশতারা নাখোশ অইব।

সেই থেকে ফেরদৌসের দৌড় ঐ গোর খোদা পর্যন্তই।

করিডোরে আয়া খানসামাদের হাকাহাকি, সাদা ইউনিফর্ম পরিহিতা নার্সদের হিলের ঠক ঠক আওয়াজ। মাথার ওপর ফুল স্পীডে ফ্যান, সাদা চাঁদরে আবৃত ফেরদৌস চাচার পাজরের ওঠানামা দেখতে দেখতে একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিল দ্রোহীর। রোগীর বিছানায় নাড়াচড়ার শব্দে তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। ঘুম থেকে উঠে বসে আছে ফেরদৌস চাচা।

X এখন কেমন লাগছে চাচা?

X বালো। বাজান খুব বালো। তোর চাচী কই?

X চাচী একটু বাসায় গ্যাছে। এখনই এসে পড়বে।

X তোর চাচীর খুব কষ্ট অইতাছে। এই তো আর কষ্ট দিমু না, কালই বাড়িতে যামুগা। কাইল রাইতে বাপজান আইছিল স্বপ্নে। কইল তোর অসুখ আর নাই রে ব্যাটা। ডাক্তাররা খালি খালি তোরে কষ্ট দিতাছে। আরে আল্লাহ্ কি এতই পাষাণ। আমি মইরা গ্যালে আমার নাবালক বাচ্চা দুইডা এতিম অইয়া যাইব। তর চাচী, আমার নূরজাহান ---------

নূরজাহানের নাম নিয়েই নেমে যায় ফেরদৌস। বিষাদে মলিন হয়ে যায় সেই সাথে মুখটা। হয়তো অতীত কোন মধুর অথবা বেদনার স্মৃতি মনে পড়েছে বেচারার।

X এডা বাংলার কি মাস রে বাজান?

X আষাঢ় মাস হয়ত।

X আষাঢ় মাস? তর মনে আছে বাজান। সেই তুই যখন খুব ছোড ছিলি। সেবার গাছে আম ধরছিল পরচুর। কিন্তুক শিলা বিষ্টিতে বেবাক শ্যাষ। বিষ্টি বিষ্টি বিষ্টি। নদী ভরপুর, থৈ থৈ। কি যে স্রোত। তখনও তুই বালো সাতার জানতি না। নদীর পাড়ে দাঁড়াইয়া তুই কইলি চাচা আমি ওপার যামু। তখন জোয়ান বয়স। তোরে পিঠে চড়াইয়া দিলাম সাঁতার। মাঝ গাঙ্গে হঠাৎ দেহি পিঠে তুই নাই। হায় খোদা কি করি। বাজান বাজান তুই কই, এদিক খুঁজি ওদিক খুঁজি। আল্লাহর কি ইশারা ঐ সময়ই ইয়ানস ব্যাপারীর চাইলের নাও হাডে যাইতেছিল। বিশ বাইশ বছর আগের ঘটে যাওয়া দূর্ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ভয়ে একটু হলেও কেঁপে ওঠে ফেরদৌস। কিন্তু পরক্ষণেই চালের নাও আর নায়ের মাঝিদের আবির্ভাব, অর্থাৎ সর্বোপরি আল্লাহ্ পাকের অসীম মেহেরবানীতে সেই যাত্রায় দ্রোহীর রক্ষা পেয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ায় স্বস্তি ফিরে আসে ফেরদৌসের মধ্যে।

X কাইল আমাদের ছাড়লে পরশুদিন চল দ্যাশে যাই। গাঙ্গে আগের মত আর পানি হয় না। তারপরও ---- আচ্ছা বাজান তোগো দ্যাশে কি নদী আছে?

X আছে চাচা। তবে বাংলাদেশের মত না।

X গোসল করা যায়?

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ে দ্রোহী।

X ও তাইলে আর কি নদী অইল? হতাশার ছাপ লক্ষ্য করা যায় ফেরদৌসের চোখে মুখে।

দীর্ঘক্ষণ নীরবতার পর আবার কথা বলে ফেরদৌস। আমি মইরা গ্যালে আমার কংকন আর অংকনের কি অইব রে বাজান?

X আপনার কি হবে? আপনি তো ভাল হয়ে যাবেন। আর তাছাড়া ----

দ্রোহীর মিথ্যা শান্তনার কর্ণপাত করে না ফেরদৌস। আপন মনে বকে চলে -

X মুখ দিছে যে আহারও দিব সে। আমি বাইচা থাকলেই বা কি করবার পারছি ওগো জইন্যে। পাগল ছাগল মানুষ আমি। যা করার তা তো করছে নূরজাহান, আমার নূরী। নূরজাহানের কথা মনে উঠতেই চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে ফেরদৌসের।

X কি সোন্দর যে ছিল বউডা আমার। কি দ্যাখলো আমার মইধ্যে আল্লাহ্পাক জানে। বাপ-মা, উচা খানদান, ধন-সম্পদ সব ছাড়ল আমার জইন্যে। কিন্তুক আমি ------ আমি কি দিলাম বউডারে। এক হাতে চোখের পানি মোছে ফেরদৌস।

X বাজানরে আমার একটা জিনিস খাইতে মন ছাইছে।

X কি চাচা?

X ঐ যে মাংসের উপর বিস্কিটের নাকি ময়দার গুড়া, পাতলা চ্যাপটা ---- ঝাল, কি জানি কি জানি নাম -----?

X কাটলেট?

X হ হ।

এখান থেকে টিএসসির ডাসে যেতে আসতে দশ মিনিটের বেশি লাগার কথা না। মনে মনে হিসেব করে দ্রোহী।

X আপনে একটু ধৈর্য্য ধরেন, আমি যাব আর আসব। ঠিক আছে চাচা?

X আইচ্ছা যা। সাবধানে যাইস। দ্রুত পা চালায় দ্রোহী টিএসসির উদ্দেশ্যে।

হাতে গরম গরম কাটলেট চপ আর পিয়াজুর প্যাকেট নিয়ে হাসপাতালে ফিরে এসে দেখে ফেরদৌস নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। শিয়রের পাশে নূরজাহান বসা।

X ও চাচী এসে গ্যাছেন? চাচা বলছিল কাটলেট খাবে।

X প্যাকেটটা রেখে তুমি বাসায় চলে যাও। আমি রাতে সময় মত চলে আসব।

নূরজাহানের প্রস্তাবে আপত্তি জানায় না দ্রোহী। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে শরীর। ধীরে ধীরে কেবিন ত্যাগ করে সে।

ফেরদৌস চাচা মারা যায় গভীর রাতে। জীবদ্দশায় যে লোকটি কাউকে কোন দুঃখ দেয়নি, জন্ম-মৃত্যুতে যে মানুষটি থাকত সদা প্রস্তুত। পার্থিব পংকিলতা আর মোহের বেড়াজালে যে লোকটি কোনদিন আবিষ্ট হয়নি। অন্যের বিপদকে নিজের মনে করে যে মানুষটি ঝাঁপিয়ে পড়ত সবার আগে। জীবদ্দশায় অন্যের কষ্ট বা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি যে মানুষটি, মরার সময়ও সেই মানুষটি কাউকে বিরক্ত করল না, কারও মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ালো না। শুধু হাসপাতালের কর্তব্যরত নার্স ঘুম জড়ানো কণ্ঠে গভীর রাতে ফোন করে জানালো - আপনাদের রোগী মারা গ্যাছে। লাশ নিয়ে যাবার ব্যসস্থা করেন।

নীরব অভিমানে বিদায় নিল একজন মহান মানুষ। ব্যাস, সব শেষ। পৃথিবীতে কি ফেরদৌসের মত ভাল মানুষ দ্বিতীয়টি আছে? থাকলে থাকতেও পারে। তবে দ্রোহীর জানামতে নেই। এই ধরনী থেকে একজন মহান মানব সন্তান বিদায় নিল আজকে এই মুহূর্তে। পৃথিবীর বয়সটা বেড়ে গেল এক ধাক্কায় কয়েক হাজার বছর। জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হলো ক্ষয়ে যাওয়া পৃথিবীর বুক।

॥ উনিশ ॥

সকাল থেকে আকাশে মেঘদের অবাধ যাতায়াত চোখে পড়ার মত। টানা তিনদিন বিরামহীন ক্রন্দনের পর ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত আকাশ এক রাতের জন্য বিশ্রাম নিয়েছিল মাত্র। সকাল না হতেই পুঞ্জিভূত দুঃখ মেঘমালার রূপ ধরে পুনরায় ক্রন্দনের তোড়াজোড় শুরু করে দিয়েছে।

একদিন ঘরের মধ্যে সম্পূর্ণ বন্দী অবস্থায় কাটিয়েছে দ্রোহী। কোথাও যাবার তাড়াও অবশ্য নেই। লাগামহীন বুনো ঘোড়ার মত পাঁচটা মাস পার হয়ে গেল ফিরে যেতে মন চাইছে না। ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যাম, মশার কামড়, কাক ডাকা ভোর, মিছিল মিটিং পিকেটিং। পরিবার পরিজন, ভালবাসা অথবা প্রত্যাখ্যান এর সবই ভাল লেগে গ্যাছে তার। আপন মনে হচ্ছে ভীষণ। কিন্তু মনের চাওয়া আর বাস্তবে পাওয়ার মধ্যে সম্পর্ক দিগন্ত জোড়া, ঠিক আকাশ এবং পাতালের মত। দেখা যায় এইতো কাছেই, কিন্তু অধরা বয়ে যায় আজীবন।

আর মাত্র দু'দিন বাদেই দ্রোহীর ফেরার পালা। আবার সেই ব্যস্ত জীবন। যন্ত্রের সাথে তাল মিলিয়ে রক্ত মাংসে গড়া মানুষের যান্ত্রিক মানুষ পরিণত হওয়া। শত ব্যস্ততা, আর যন্ত্রের যাতাকলের পেষণে হাসফাস অবস্থার মধ্যেও যার কথা ভাবতে, যাকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনতে, যাকে মনের মানসী হিসেবে কল্পনার বাসর শয্যায় নববধুর অপরূপ সাজে দেখে বিনিদ্র রজনী গুলো অসম্ভব ভাল লাগার ভরে উঠত। সেই ভাল লাগার মানসীকে চিরতরে হারাতে যাচ্ছে দ্রোহী। বর্ষার সঙ্গে তার ক্রশ কানেকশনে দৈবযোগ, অতঃপর আলাপচারিতা কিন্তু বর্ণহীন। সেলুলয়েডের ফিতায় একসময় বর্ণের আবির্ভাব। দৃশ্যপটে পরিবর্তন, হালকা আলাপ থেকে কিঞ্চিত ভাললাগা, আরও বেশি ভাললাগা, ভালবাসা। শেষ দৃশ্যে একটা ঘর থাকার কথা ছিল। সুন্দর সাজানো, গোছানো ছোট্ট একটা ঘর। এক চিলতে উঠোন,

উঠোনের শেষ প্রান্তে একটা আমগাছে। আম গাছের কঁচি পাতা আর মুকুলের গন্ধে মৌ মৌ চারদিক। কি অসম্ভব ভাললাগা, অসহ্য রকমের সুন্দর। কিন্তু ছন্দময় মোশন পিকচারে হঠাৎ করেই ছন্দপতন। সমস্ত বর্ণ, গন্ধ, রং আর ভাললাগার ইতি হতে চলেছে দ্রোহীর জীবন চলচ্চিত্রে। সেই ইতিকথার পরের কথা ভাবতেই ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে ওঠে তার। বর্ষার সাথে শেষ দেখা করবার তাগিদও অনুভব করে সেই সাথে।

তিন দিনের অবিরাম বর্ষণে রাস্তাঘাট কাঁদায় কাঁদায় সয়লাব। মাঠে অথবা দিঘীর পাড়ে ঘাসের ওপর বসবার জোগার নেই। তবে দিঘীর ঘাটের সিমেন্টের বেদীটা এখনও বসবার উপযোগী। দ্রোহী আর বর্ষা দু'জনে পাশাপাশি বসে আছে চুপচাপ। নীরবতা ভেঙ্গে দ্রোহী কথা বলে -

X কথা বলছ না কেন?

X কি বলব?

X কাল আমি চলে যাচ্ছি।

X জানি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে বর্ষা।

X আচ্ছা, আমাকে আপনি খুব ঘৃণা করেন তাই না?

কোন উত্তর দেয় না দ্রোহী। সামান্য একটু হাসে কেবল। সে হাসির অর্থ বর্ষা বোঝে হয়ত হাসেনা, অথবা হাসে।

X কি? বোকার মত প্রশ্ন করছি আমি তাই না? ঠিক আছে অন্য একটা প্রশ্ন করি X এই যে আমাদের দু'জনের পরিচয়, ফোনে কথাবার্তা, এই ক্যাম্পাসে দু'জনে এক সঙ্গে কাটানো সময়গুলো, এর সব কি আপনার মনে থাকবে। অথবা আজকের এই মুহূর্তটা, এই মাত্র যে বাক্যটা বললাম তা কি আপনার মনে থাকবে?

X তুমি যে প্রশ্নগুলো করলে সেগুলো আমার মাথায় কখনও আসেনি। কাজেই তার উত্তর আমার জানা নেই। যেহেতু প্রশ্নটা তোমার, সেহেতু উত্তরটাও তোমার জানা। তোমার প্রশ্ন তোমাকেই ফিরিয়ে দিলাম। থাকবে? তোমার মনে?

X হ্যাঁ ---- থাকবে। আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলে চলে বর্ষা -

X দেখেছেন আকাশে কেমন মেঘ করেছে। দশদিক জোড়া মেঘ। যে কোন সময় বৃষ্টি নামবে। চলেন হলে ফিরি।

X না আজকে বৃষ্টিতে ভিজব।

X মাথা খারাপ হয়েছে আপনার? যাওয়ার সময় অসুখ বাধাবেন নাকি?

X হলোই বা অসুখ। একটুখানি সর্দিজ্বর। তোমার আজীবন মনে রাখার তালিকায় না হয় আরেকটা ঘটনা যোগ হয়ে থাক।

ওদের তর্কাতর্কি শেষ হবার আগেই বৃষ্টি নামে। ঝম ঝম বৃষ্টি।

এভাবে ভিজতে দেখলে লোকে পাগল বলবে। অন্তত ঐ আম গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াই। চষবধংব দ্রোহীর হাত ধরে টানতে থাকে বর্ষা। গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় ওরা দু'জন। শাখা প্রশাখা আর পাতা ভেদ করে বৃষ্টির পানি ওদেরকে খুব একটা ছুঁতে পারে না। কিন্তু মুশকিল বাধায় ঝড়ো হাওয়া। বাতাসের ঝাপটায় নিমিষে ওদেরকে কাক ভেজা করে দেয়। অন্ধকার হয়ে গ্যাছে চারপাশ। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কাছে ধারে অনেক বাজ পড়ার শব্দও শোনা যায়। কতক্ষণ কেটে গ্যাছে জানে না দ্রোহী। হঠাৎ সে আবিস্কার করে, একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বর্ষা। ইচ্ছে করলেই হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। সিক্ত বাসনা বর্ষার অধর, কপোল, চিবুকে অথবা কপালে অধর ছোঁয়াতে সাধ জাগে দ্রোহীর। অনেক কষ্টে সেই সাধটাকে দমন করে সে। আকাশের ঝর ঝর অবিরাম কান্নায় শত সহস্র ফোটা গাছের ডালপালা আর পাতা ভেদ করে টুপটুপ করে বর্ষার মাথায় পড়ে। সেই অশ্রু ফোটা গুলো বর্ষার দেশকে সিক্ত করে চোখ মুখ আর কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। অবাক নেত্রে তাকিয়ে থাকে দ্রোহী প্রকৃতির দুঃখে ক্রন্দনরত বর্ষার দিকে।

কিছু একটা বলার উদ্দেশ্যে দ্রোহীর দিকে চোখ তুলে তাকায় বর্ষা। দ্রোহীর চাহনী দেখে অব্যক্ত কথা অব্যক্তই থেকে যায়।

X আমার দিক থেকে চোখ নামিয়ে নিলে কেন বর্ষা? তাকাও।

X আপনি অমন করে তাকিয়ে আছেন ক্যানো?

থুতনিতে অনামিকা ছুইয়ে বর্ষার অবনত দৃষ্টিকে নিজের দিকে ফেরানোর চেষ্টাকরে দ্রোহী। ভীত নয়নে তাকায় বর্ষা। কাঁপছে মেয়েটা একটু একটু। বর্ষার তপ্ত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পায় দ্রোহী।

X শোন বর্ষা।

X হুম।

X আমাকে তুমি বিয়ে করবে?

ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে বর্ষা। এক সেকেন্ডে, দুই সেকেন্ড, এক মুহূর্ত অথবা কয়েক মুহূর্ত। ধীরে ধীরে ওপর নীচ মাথা নেড়েই দ্রোহীর বুকে মুখ লুকোয় বর্ষা। প্রতিউত্তরে বর্ষাকে দু'হাতে কাছে টেনে নেয় দ্রোহী।

X তাহলে কাল সকালে আমি টিকেটটা ক্যান্সেল করে সোজা এখানে চলে আসব। তুমি তৈরী থেকো। ঠিক আছে?

দ্রোহীর বুক থেকে মুখ সরায় না বর্ষা। আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে দ্রোহীকে। দমকা হাওয়া এসে বর্ষার চুলগুলো নিয়ে খেলা করে, লেপটে দেয় দ্রোহীর চোখে মুখে। আহ্, কি এক অপূর্ব মাদকতায় দ্রবীভূত হচ্ছে সে ধীরে ধীরে। হে বাতাস, তুমি আরও জোরে বয়ে যাও। দীপ থেকে দীপান্তরে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। হে আকাশ, বিজলীর চমকে চমকে আগুল রাঙা আতশবাজীতে নিজেকে সাজিয়ে নাও। বর্ষা ঐ কালো আকাশের অসীম কষ্টের শেষ অশ্রু বিন্দু নিংড়ে ধরনীকে প্লাবিত কর তুমি। সবুজে সবুজে ভরে যাক খরাগ্রস্ত বিশাল এই ধরনীর মরু বক্ষ। এসো এসো হে বর্ষা আমার প্লাবিত করে দাও, ভাসিয়ে নিয়ে যাও হেথা নয় হেথা নয় অন্য অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে।

॥ বিশ ॥

X আমি কালকে যাচ্ছি না।

X যাচ্ছি না মানে? অনেকগুলো কণ্ঠ কোরাসে একই প্রশ্ন করে দ্রোহীকে।

X যাচ্ছি না মানে কতদিন পর যাবো?

টিকেটটা আসলে কনফার্ম করা ছিল না। আমি জানতাম না যে তিন দিন আগে কনফার্ম করতে হয়।

দ্রোহীর আমেরিকা ফেরত যাবার দিন ঘনিয়ে আসায় ক্যামন যেন একটা বিষাদের কালো মেঘ এ বাড়ির সদস্যদের মুখমন্ডলে নেকাবের মত আবৃত করে রেখেছিল। সুখে যেমন উৎসব হয়, বেদনায়ও তেমনি উৎসবের রবে গমগম করছে। সারাদিন এ আত্নীয় ও আত্নীয়, কাছের-দূরের। নিছক বিদায় সাক্ষাৎ বা সৌজন্য সাক্ষাৎ কোনটাই একে বলা যায় না। ছেলেকে বা মেয়ের জামাইকে বা ভাগ্নেকে বা ছোট ভাইকে বা কখনও নিজেকেই কিভাবে আমেরিকায় চালান করা যায় সেই ব্যাপারেই মূলতঃ বেশির ভাগ আত্নীয়-স্বজনের আগমন। আবুল কালাম আজাদ শেষ পর্যন্ত আশা ছাড়েনি। প্রায় প্রতিদিনই আসে এবং দ্রোহীর জন্য অপেক্ষা করে, না পেয়ে হাসিমুখে শেষ বেলায় বিদায় নেয় বাদামতলী বা সোয়ারীঘাটের পাওনাদারদের তাগিদ দিতে।

পুতুল, নাহার আর হাবিব মিলে দ্রোহীর লাগেজ গুছাচ্ছিল। আচমকা দ্রোহীর ঘোষণা শুনে ওরাও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

X হা করে তাকিয়ে আছিস কেন? ছাদে চল। হাবিবকে উদ্দেশ্য করে বলে দ্রোহী। ছাদে উঠতে উঠতে হাবিব জিজ্ঞসা করে কি ব্যাপার বন্ধু বলতো।

X আমি কালকে বিয়ে করছি।

X বলিস কি?

X হ্যাঁ কোর্ট ম্যারেজ।

X বাসার কাউকে বলবি না?

X আজকে না। কালকে সকালে যাওয়ার সময় শুধু মাকে বলে যাব। আজকে তোদের বাসায় যেয়ে কাজ নেই। এখানেই থেকে যা। সকালে তোকে আমার সাথে যেতে হবে।

X ঠিক আছে যাব। তোর এই দুঃসাহসিক সুসংবাদের সাথে সাথে আমার একটা সুসংবাদ দেই, ক্যামন?

X দাঁড়া আমাকে অনুমান করতে দে।

X কর।

X নাহার প্রাগনান্ট?

X নাহ্।

X তোর শ্বশুর জানে ফুফাজানের মামলার রায় হয়েছে? এবং বেকসুর খালাশ?

X হলো না। বাদদে পারবি না। আমিই বলে দিচ্ছি।

X আজকে আমরা দুজন মানে আমি আর নাহার আমেরিকান এমব্যাসীতে দাঁড়িয়েছিলাম, ইঁংরহপবংং ঞঁড়ৎ এর কাগজপত্র নিয়ে। ঠরংধ দিয়ে দিয়েছে।

X ওয়াও। ওয়েলকাম টু আওয়ার ল্যান্ড। ভালই হলো। এক সংগেই ফ্লাই করা যাবে। এখন গো, গেট রেস্ট। কালকে সকালে সকালে কথা হবে। অসম্ভব অস্থির লাগছে দ্রোহীর। রাত যত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে, অস্থিরতার মাত্রা ততই বেড়ে চলেছে। বিশ্রামরত অবস্থায় হার্টবিট সাধারণতঃ এত দ্রুত থাকে না। এপাশ ওপাশ করে, কখনও ভেরা গুনে, কখনও উল্টোদিক থেকে সংখ্যা গুনে মনকে স্থির করার চেষ্টা করে। ভয় পাচ্ছে কি দ্রোহী? নতুন জীবনে প্রবেশ করার ভয়। এতে ভয় পাবার কি আছে? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে সান্ত্বনা নেবার চেষ্টা করে দ্রোহীর। ধক ধক ধক - বেড়েই চলছে ধক ধক ধক।

কা কা কা ---- আল্লাহু আকবর। সামনের রাস্তায় মিউনিসিপালিটির চাপকল চাপার শব্দ কচক কচক, কা কা ---- শেষ রাতের দিকে একটু তন্দ্রার মত এসেছিল বোধ হয়। অনেক গুলো উৎসের সমষ্টিগত শব্দে সেই তন্দ্রার ব্যত্যয় ঘটে দ্রোহীর। হৃৎপিন্ডের ধড়ফড়ানিটা আর নেই। অল কোয়ায়েট অন দ্য হার্টফ্রন্ট।

ঝটপট বিছানা ছেড়ে সকালের কার্যক্রম নিমেষে শেষ করে, কাপড় পরে নীচে নেমে আসে সে। ইতিমধ্যে হাবিবও তৈরী হয়ে নিয়েছে। আস্তে আস্তে মায়ের ঘরের ভেড়ানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে। অঘোরে ঘুমাচ্ছে সালমা বেগম। রাতে প্রেসার বেড়ে পাওয়ায় ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়েছে হয়তো। মাকে সালাম করে বের হবার ইচ্ছা স্থগিত রেখে বাইরে চলে আসে দ্রোহী। সালমা বেগমের পাশে শোয়া পুতুলও নিঃশব্দে দ্রোহীর পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে আসে।

X ছোট মামা আমরা সব জানি। হি হি।

X আমরা মানে?

X আমরা মানে আমি, বড় মামা, মামী, নানু, আম্মু। তোমার এই পাগলামোর কথা শুনেইতো রাতে নানুর প্রেসার হাই হয়ে গ্যাছে। মামা, কাজটা কি ঠিক হবে?

X ঠিক বেঠিক বুঝিনা। এখন আর পেছানোর উপায় নেই। আমি কথা দিয়েছি। তুই সারাক্ষণ নানুর সাথে থাকবি। আমি এসে ম্যানেজ করব। এখন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যা।

দেরী না করে হাবিবকে সংগে করে বেড়িয়ে যায় দ্রোহী।

ঢাকা শহরে অনেক রাতে অথবা খুব ভোরে চলাচলে বেশ একটা মজা আছে। তবে অনেক রাতে চলাচলে বিপদের মাত্রাটাও কম না। ঢাকার রাস্তায় এই মুহূর্তে কিছু মসজিদ ফেরত মুসল্লী, কিছু প্রাত ভ্রমণকারী, দু'একটা রিক্সা আর ডাস্টবিনের পাশে আড়ামোড়া ভাঙ্গা কিছু নেড়ী কুত্তা ছাড়া আর কোন প্রাণী নেই। কোন রকম থামাথামি ছাড়াই হাবিবের গাড়ি গাবতলী ছাড়িয়ে যায়।

X কিরে চুপচাপ বসে আছিস যে? আমার বিয়ের সময় খুবতো টিটকিরি মারছিলি। এখন বোঝ সপ্তাহে কয়দিন।

X ঠিকই বলেছিস, রীতিমত হাটু কাঁপছে।

X কাঁপার এখনই কি দেখলি। সবেতো শুরু। হা হা হা। হিন্দী গান শুনবি।

X না।

X আরে শোন না ভাল লাগবে। ক্যাসেট প্লেয়ারে ক্যাসেট ঢোকানোই ছিল। প্লে বাটনে চাপ দেয় হাবিব। প্লেয়ার বেজে ওঠে -

মেহেন্দী সাজাকে রাখনা - ডোলি সাজাকে রাখনা ------ এটা আমার ফেভারিট গান। পুরো ক্যাসেটে শুধু এই গানই। হ্যাঁ বা না, ভাল কি মন্দ কোন উত্তর দেয় না দ্রোহী। মনযোগ দিয়ে গান শুনছে সে আর কাঁপাকাঁপি বন্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে আপ্রাণ। একবার দু'বার তিনবার, সে জানে কেন গানটা শুনতে তার মন্দ লাগছে না।

নার্ভাসনেস কেটে গ্যাছে অনেকক্ষণ। চঞ্চল মনটা হঠাৎই আনমনা হয়ে যায়। গানের কথাগুলো অতি নিজস্ব হয়ে দ্রোহীর সেই আনমনা মনে বসন্তের মৃদু হিলোল জাগায়। বসন্তের মৃদু হিলোল হৃৎপিন্ড থেকে তরঙ্গায়িত হয়ে শরীরের উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে ধীরে ধীরে নিস্তেজ করে দেয়।

কখন যে চোখ বুজে এসেছিল মনে নেই দ্রোহীর। চিৎকার চেচামেচিতে ঘুম ভাঙ্গে তার। গাড়ির জানালা খুলে চিৎকার করে কার সাথে যেন কথা বলছে হাবিব। সামনে, পেছনে থেকে ক্রমাগত হর্নের প্যা পো। শালার হাইড্রোলিক হর্ন। কানের বারটা বুঝি সকালেই আজকে বেজে যাবে।

X কি হয়েছেরে দোস্ত?

X ঠিক বুঝতে পারছি না। একেক জন একেক কথা বলছে। সামনে জ্যাম। উল্টো দিক থেকে কোন গাড়ি আসছেনা। শুধু পায়ে হাটা মানুষ। হাতে, কাঁধে, পিঠে পোটলা-পুটলি। বোঝা যায় বাসযাত্রী। বাস থেকে নেমে হাটা শুরু করেছে।

X কি, ঘটনা কি? আবারো প্রশ্ন করে দ্রোহী হাবিবকে।

X কেউ বলে রাতে গোলাগুলি হয়েছে, কেউ বলছে মেয়েদের হলে কোন মেয়ে আত্নহত্যা করেছে, আবার কেউ -------

X এই যে ভাই, কি অইছে কইতে পারেন?

ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে উল্টো দিক থেকে হেটে আসা এক সয়স্ক বাস যাত্রীকে জিজ্ঞেস করে হাবিব।

X কি আর অইব। গজব পড়ব জালিম লোকগুইলার উপর। মাই বুইনরা আর ইজ্জত লইয়া দ্যাশে থাকবার পারব না। অদৃশ্য ইজ্জত লুণ্ঠনকারী আর গভর্মেন্টের বংশ নির্বংশ করতে করতে বয়স্ক লোকটি গন্তব্যের দিকে হাটতে থাকে।

X দোস্ত তুই এখানে থাক, আমি হেঁটে চলে যাই।

X সে তো অনেক দূর। বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। এধরনের গন্ডগোল হরহামেশা হয়েই থাকে। ঘন্টা, বড়জোর দুই ঘন্টা। জ্যাম ছুটে যাবে।

X ভাল কথা। জ্যাম ছুটে গ্যাছে তুই এগিয়ে যাবি আর পথ থেকে আমাকে তুলে নিবি। ওকে?

হাবিবকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হাঁটা শুরু করে দ্রোহী।

ইউনিভার্সিটির গেটের কাছে ছাত্রীদের বিশাল জটলা। ঢাকা-আরিচা সড়ক অবরুদ্ধ করে ছাত্রীরা রাস্তার ওপর বসে আছে। পুলিশের হোমরা চোমরা বেশ কয়েকজন ওয়াকিটাকি হাতে এমাথা ওমাথা করছে। শিক্ষক বা ভিসি শ্রেণীর কয়েক জনকেও দেখা যায় এমাথা ওমাথা করতে।

আসতে আসতে ঘটনা জেনে গ্যাছে দ্রোহী। গত রাতে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা হল থেকে কয়েকটা মেয়ে কিডন্যাপ করে এনে ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণতো করেছে করেছেই বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে নাকি আবার ধর্ষণের সেঞ্চুরী উৎসবও পালন করেছে তারা। এও কি সম্ভব? দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা। নো ওয়ে। একদিকে চর্কির মত ঘুরছে একজনের জন্য। কমসেকম বর্ষার কোন বান্ধবীকে পেলেও তো চলে। গেটের উল্টো দিকে একটা টবের পাশে দাঁড়িয়ে চারপাশে লক্ষ্য করছে দ্রোহী।

মিলজা ছম ছম, মিলজা ছম ছম।

X দ্রোহী ভাই।

অচেনা জেনানা কণ্ঠের ডাকে পাশ ফিরে তাকায় দ্রোহী।

মেয়েটাকে চেনে সে। বর্ষার রুমমেট যুথী।

X আরে যুথী, কি খবর?

X ভাল না বুঝতেই তো পারছেন।

X ওম। বর্ষা কোথায়?

প্রশ্নটা শুনে বোবার মতে তাকিয়ে থাকে যুথী। যেন সে কিছুই বুঝতে পারেনি। অথবা দ্রোহীর প্রশ্নটা এখনও অসম্পূর্ণ। বাকীটা শোনার অপেক্ষায় আছে যুথী। কিন্তু মেয়েটার চোখ ছলছল কেন? ঢং ঢং ঢং ----- মস্তিস্কের নিউরোনে একটা ঘন্টার শব্দ বেজে ওঠে। বিপদের ঘন্টা, জেলের পাগলা ঘন্টা। এতক্ষণ ভুলেও যে সম্ভবনার কথা উঁকি মারেনি দ্রোহীর মনের কোণে, সেই সম্ভাবনাটা উঁকি মারল কোন এক পাহাড়ের আড়াল থেকে। ক্ষণিকের জন্য মাত্র। আরে ধ্যাৎ হতেই পারে না। কিন্তু মেয়েটার চোখ ছল ছল কেন? এইতো আবার উকি মারল সম্ভবনাটার কথা। এবারে পাহাড়ের আড়াল থেকে নয়, ছোট টিলার আড়াল থেকে। যেভাবে এগিয়ে আসছে তাতে হঠাৎ একেবারে সামনে জলজ্যান্ত সত্য হয়ে না দেখা দেয়। ধুর যা হতেই পারে না। কিন্তু মেয়েটার চোখ ছল ছল কেন? ওর ঠোঁট কাঁপছে। ওকি কিছু বলতে চাইছে? কি বলতে চাইছে যুথী? হ্যাঁ বল।

X বর্ষা এখন ঢাকায়। সী ইজ অন অব দ্য ভিকটিমস।

ঢং ঢং ঢং। পাগলা ঘুন্টি বাজছে অবিরাম। ধক ধক ধক। হৃৎপিন্ড আর কানের মাঝখানে অ্যামপ্লিফায়ার। ধক ধক ধক। পাগল ঘুন্টির চেয়েও দ্রুত আর জোরে কাপছে হৃৎপিন্ড। যেন ছিড়ে বেরিয়ে পড়বে বুঝি এখনই। পায়ের নীচে মাটি স্থির নেই। টেকটনিক প্লেটে সংঘর্ষ হয়েছে কোথাও। টলমল পায়ের নীচের পৃথিবী। মাথার ওপর রুক্ষ ধুসর আকাশ, তারই মাঝে একজোড়া চিল ডানা মেলে ঘুরছে। নাকি আকাশটা ঘুরছে আর চিল দুটো স্থির ডানা মেলে।

X দ্রোহী ভাই, দ্রোহী ভাই।

কেউ কি ডাকছে তাকে? ডাকুকগে। তাকে অনেকটা পথ যেতে হবে। দেরি করলে চলবে না। টলমল পায়ের দোদুল্যমান ওপর তল। ঢং ঢং ঢং। পাগলা ঘুন্টি। ধক ধক ধক হৃদস্পন্দন।

॥ একুশ ॥

পাঁচ ছয়বার কলিং বেল বাজানোর পর বয়স্ক এক ভদ্রলোক দরজা খোলে। ভদ্রলোকের পরনে সাদা হাফ হাতা ফতুয়া আর সাদা লুঙ্গি। মাথায় বিশাল টাক, মুখে ফ্রেন্সকাট দাঁড়ি। টাকের চারপাশে যে কটা চুল আছে সে গুলো উস্ক খুস্ক, কপালে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ। লোকটার চেহারার সঙ্গে বর্ষার চেহারার কোন মিল খুঁজে পায় না দ্রোহী। তবুও ধারণা করে নেয় লোকটার পরিচয়।

X কাকে চাইছেন?

X আসসালামু আলাইকুম। জ্বী আমি মানে বর্ষার সংগে ---------

X আপনি কোথা থেকে এসেছেন? দরজা আগলিয়ে পূর্ববত বিরক্তি ভরে প্রশ্ন করে বর্ষার বাবা।

X ইয়ে মানে আমাকে ------

X দ্যাখেন আপনি যদি কোন সংবাদ পত্রেরলোক হন তাহলে আপনাকে আমার সরি বলতে হবে।

X না না। আমি সংবাদপত্রের কেউ নই। আমরা নাম দ্রোহী। বর্ষার পরিচিত।

X ও আচ্ছা। এসো তুমি ভেতরে এসো।

ড্রইং রুমে এসে দ্রোহীকে বসতে ইঙ্গিত করে ভদ্রলোক। কি বলে সম্বোধন করবে ভেবে পায় না দ্রোহী। আংকেল নাকি খালু নাকি চাচাজান। শেষে কোন সম্বোধন ছাড়াই বলে -

X বর্ষা কি এখন বাসাতেই আছে? ক্যামন আছে ও?

X হ্যাঁ বাসাতেই আছে। হাই পাওয়ারের ঘুমের ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার। মানসিক ধাক্কাটা নাকি আগে সামলানো দরকার। আমি জানিনা তুমি এত তাড়াতাড়ি কোথা থেকে খবর পেলে।

ভদ্রলোকের প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না দ্রোহী। পাল্টা প্রশ্ন করে -

থানায় মামলা বা জি ডি সহ যা যা করার করা হয়েছে কি? দ্রোহীর প্রশ্ন শুনে দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকে ভদ্রলোক। তারপর দ্রোহীর চোখে স্থির চেয়ে থেকে বলে - দেখো বাবা, এই ঘটনার ভিকটিম শুধু আমার মেয়ে একা নয়। আরও একজন আছে। বর্ষার নামটা এখনও ফ্লাশ হয়নি। প্রথম ধাক্কাতেই যখন হয়নি, তখন আর হবেও না ইনশাল্লাহ। শেষের শব্দটা বেশ জিকিরের মত করে উচ্চারণ করে ভদ্রলোক।

X আপনার কথাটার মানে বুঝলাম না।

X গু ড়হ, মিথ্যে বলব না। তোমার সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা আমার ছিল। কিন্তু আজকে এই ঘটনার পর তুমি যখন আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, তখন সেই ধারণাটা আমূল পাল্টে গেল। তুমি দীর্ঘদিন আমেরিকায় আছ। নিশ্চয়ই বাস্তববাদী। এ পর্যন্ত বলে একটু দম নেয় ভদ্রলোক। তারপর আবার বলতে শুরু করে।

X মিডিয়ায় ওর নামটা এখনও আসেনি। আল্লাহ্ পাকের মহিমায় নামটা যখন ফ্লাশ হয়নি, তখন এ ব্যাপারটা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করাটাই ভাল। বোঝই তো আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা কি ধরনের। তাছাড়া আমি সরকারি চাকুরী করি। ওপর থেকে ইতিমধ্যে ---- থাক ওসব কথা। তুমি আমাদের একান্ত আপনজন বলেই কথাগুলো বললাম।

বলে কি লোকটা? থানায় মামলা করার সাথে বাস্তববাদ, অবাস্তববাদ, সমাজ ব্যবস্থা, আল্লাহ্পাকের রহমত, আপন জন এসবের সম্পর্ক কি? লোকটা কি আলেম নামক জালেম নাকি শয়তান? আর এক মুহূর্তও এই ইবলিশের সামনে থাকতে মন চাইছে না দ্রোহীর। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখে সে।

X আমি কি ওকে একটু দেখতে পারি?

X ও হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ভদ্রলোক দ্রোহীকে পথ দেখিয়ে বর্ষার ঘরের দিকে নিয়ে যায়।

পর্দা সরাতেই এক মধ্য বয়স্কা মহিলার সঙ্গে চোখাচোখি হয় দ্রোহীর। পরিচয়ের দরকার পড়ে না। মহিলার মধ্যে মধ্যবয়স্কা বর্ষাকে দেখতে পায় সে।

X স্লামালেকুম। ক্যামন আছেন?

X কোন উত্তর দেয় না মহিলা। কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। বর্ষার শিয়রের কাছে একটা চেয়ার টেনে মহিলা বসে ছিল। দ্রোহীকে আসনটি ছেড়ে দিয়ে নিজে উঠে যায়।

X তুমি এখানটায় বোসো। আমি আসছি।

মহিলা চলে যায়। বোধ হয় চা টা আনতে গ্যাছে। একা হয়ে যায় দ্রোহী। সামনে আপাদমস্তক চাদর গায়ে গভীর নিদ্রায় শায়িত বর্ষা। বর্ষার চোখের পাতা মাঝে মাঝে কাঁপছে। স্বপ্ন দেখছে হয়তো। বর্ষাকে ঘুম থেকে জাগাতে খুব ইচ্ছে হয় দ্রোহীর। ইচ্ছে হয় বর্ষার কম্পিত চোখের পাতায় --------। ইচ্ছা তো কতকিছুই ছিল দ্রোহীর। সব ক্যামন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বারবার।

বর্ষার শিয়রের কাছে বসেই প্রথম টের পায় দ্রোহী তার জ্বর আসছে। বসে থাকতে পারছে না সে। এখন তার একটু আশ্রয় দরকার। নিশ্চিত আশ্রয়। যে আশ্রয়ের ছায়া তলে সে নিশ্চিন্তে একটু ঘুমাতে পারবে। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চাইছে না দ্রোহী। এই বাড়ির লোক গুলোকে অসহ্য লাগছে তার। সমস্ত শরীরের নরকগুলজার, মাথায় প্রচন্ড যন্ত্রণা। নাহ্ আর পারছে না সে। টলমল পায়ে ঘর থেকে বের হয় সে। ড্রইং রুম পেরিয়ে সোজা বাইরে। পেছন থেকে কেউ তার নাম ধরে ডাকছে। ডাকুকগে। কারও ডাক এখন সে শুনবে না। তার এখন একটু ঘুমানো দরকার। নিশ্চিত আশ্রয়ে শান্তির ঘুম।

॥ বাইশ ॥

নিজের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, নিঃশ্বাসের সাথে ঘৎ ঘৎ শব্দ আর সেই সাথে খুব পরিচিত একটা গন্ধে ঘুম ভাঙ্গে দ্রোহীর। লেপের

নীচে আপাদমস্তক আবৃত অবস্থায় গন্ধটার পরিচিতি আর উৎপত্তিমূল খোঁজার চেষ্টা করে। চোখ দুটো এখনও বন্ধ। খুলতে সাহস পাচ্ছে না সে। নিজের তপ্ত নিঃশ্বাস, নতুন লেপ আর সেই গন্ধটা মিলে একটা মাতাল মাতাল পরিবেশ তৈরী হয়ে আছে। চোখ খুললে সেই মাতাল আবেশ কেটেও যেতে পারে। গন্ধ, গন্ধ, খুব মিষ্টি একটা গন্ধ। প্রিয় ভীষণ প্রিয় সেই গন্ধ। ঘরের মধ্যে থেকেই দ্রোহী আবিস্কার করে যে সে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে শুয়ে আছে। আহ্ কি যে শান্তি। এই বিলেত এর চাইতে শান্তির আর পরম নিশ্চিত আশ্রয় আর বুঝি দ্বিতীয়টি নেই।

X এখন ক্যামন লাগছে বাবা? সালমা বেগমের কণ্ঠ।

X ভাল, মা। আপনি ঘুমান নাই?

X ঘুমাইছিলাম। তা তুই হঠাৎ জেগে উঠলি ---

X কি ভাবে জানলেন যে আমি জাগনা?

X ওসব তুই বুঝবি না। নিজের সন্তান হলে তখন হয়ত বুঝবি। ক্ষুধা পাইছে? কিছু খাবি?

X না মা কিছু খাব না। আপনে একটুও উঠবেন না এখন।

X কিছু না খাইলে চলব? সেই সন্ধ্যায় গায়ে জ্বর নিয়ে হাজির এসেই শুয়ে পড়লি। সে কি জ্বর। আর সেই সাথে ছটফটানি। এই ঘন্টা খানেক হলো জ্বরটা কমছে। একটু বার্লি দেই খা?

X না মা এখন কিছু খাব না, একটু পরে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সালমা বেগম। সেই সাথে ছেলের পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়।

আবার মাতাল মাতাল লাগছে দ্রোহীর। আবেশে চোখ বুজে আসছে।

X মা, মাগো।

X কি, বল।

X না কিছু না, এম্নি।

X এম্নি না। আমারে তুই কিছু বলতে চাস? বলে ফেল। ভেতরে কথা চাপা রাখা ভাল না।

মায়ের বুকে আগের মতই মুখ লুকিয়ে ধীরে ধীরে বলে দ্রোহী

X আমার সবকিছু ক্যামন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। ভেবে রাখি এক রকম, আর হয় সব অন্য রকম।

X কিছুই এলোমেলো হয় নাই বাবা। আল্লাহকে ডাক। সব ঠিক হয়ে যাবে। এত অল্পতে ঘাবড়ালে কি আর চলে? সেই যে জুতার কবিতাটার কথা মনে নাই? একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে জুতা নাই বলে কত দুঃখ, কিন্তু আরেক জনের যে পা নাই, তার কি পরিমাণ দুঃখ হতে পারে?

X মা, আমি এমন কিছু যদি করি, যা নাকি আত্নীয় স্বজনের মধ্যে সমালোচনা বা আপনাদের সম্মান হেয় হয়, তাহলে কি আমার উপর রাগ করবেন?

X একজনের মান সম্মানে অন্য একজন কখনও হেয় করতে পারে না। নিজেরে জিজ্ঞাসা করে দেখবি, যে কাজটা তুই করতে চাস তা কতটুকু ভাল। ভাল কাজ করলে আল্লাহপাকই তোর সম্মান বাড়াবে। মানুষ সেই সম্মান কমায় সাধ্য কি। তবে আমি বলি কি শরীরটা ভাল হলে, আপাততঃ তুই আমেরিকায় ফিরে যা। আবার মাস ছয়েক পরে, একটু শীত পড়লে ---

X মা, আপনি আমাকে চলে যেতে বলছেন?

X চলে যেতে কি আর বলতে চাই? তবু বলতে হয়। ইচ্ছা তো হয় সারা জীবন তোরে এই ভাবে বুকে আগলে রাখি। কোন দুঃখ, কোন কষ্ট, কোন বিপদ যেন স্পর্শ না করতে পারে। কিন্তু আমি চাইলেই কি আর সব হয়। আমার অন্তরটা ছিড়ে যায় না যখন ভাবি তুই আবার আমারে ছেড়ে চলে যাবি, কোন দূর পরবাসে। কি খাবি, কি পরবি, পথে ঘাটে বিপদ, অসুখ বিসুখে কি করবি, তখন -----

কষ্ট নিস না বাপ, আর কোন দিন বলব না। এক হাতে আঁচল দিয়ে নাক আর চোখের পানি মোছে সালমা বেগম।

X এখন একটু বার্লি দেই?

X কিছু কি বলছে মা? বলছে হয়তো। তবে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না দ্রোহী। আবার জ্বর আসছে তার। তলিয়ে যাচ্ছে যেন, হারিয়ে যাচ্ছে তলহীন অতলে।

পাক্কা সাতদিন পর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায় দ্রোহী। তবে শরীর মন দু-ই-ই- অসম্ভব দুর্বল। এই দুর্বল শরীর নিয়েই প্রথমে সে বর্ষাদের বাসায় যায়। বর্ষাদের বাড়ির পরিবেশটা আজকে যেন অন্য রকম লাগছে। বর্ষার মা, বাবা, বা কুলাউড়া থেকে আসা ওর বড় বোন, সবারই চেহারা মলিন। দুর্ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। কিন্তু তদুপরি একটা চাপা আনন্দও যেন লক্ষ্য করে দ্রোহী। ব্যাপারটা খোলাশা হয় বর্ষার বাবার কাছে থেকেই। ভদ্রলোক এতদিন ছিল জনতা ব্যাংকের পল্টন শাখার এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার। আজকে অফিসে গিয়ে খোশ খবরি শুনতে পায় সে। এক লাফে কেন্দ্রীয় ডি সি এম। এটা সে তার কর্মের সততা এবং দক্ষতারই ফল তা বলতেও ভুলে না ভদ্রলোক।

বর্ষার ব্যাপারটা আলাপ করে দ্রোহী। পুলিশ রিপোর্ট, মামলা, ডাক্তারী রিপোর্ট এসব। কিন্তু খুব একটা গাঁ করে না ভদ্রলোক। এ কথা, ওকথা, কখনও বা উপদেশ, কখনও বা মহাপুরুষের বাণী।

দুর্ঘটনার পর সেদিনই প্রথম বর্ষার সঙ্গে দেখা হয় দ্রোহীর। নির্বাক তাকিয়ে থাকে বর্ষা কিছুক্ষণ। চোখে মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। অনেকটা রোবটের মত। ক্যামন আছে জিজ্ঞেস করায় কোন উত্তর দেয় না। শুধু তাকিয়ে থাকে। তারপর এক সময় হাঁটুতে কপাল ঠেকিয়ে নিশ্চুব বসে থাকে। থাকতে পারে না দ্রোহী বেশিক্ষণ, ঐ নিশ্চল, নিশ্চুপ পাথরের মূর্তির সামনে।

সেদিন চলে গেলেও পরদিন থেকে নিয়মিত এ বাড়িতে আসে দ্রোহী। চেষ্টা করে বর্ষার মা বাবা অথবা বোনকে এড়িয়ে যেতে। যতটা সময় একা পাওয়া যায় বর্ষাকে, ততক্ষণই এ কথা,

ও কথা, পুরোনো স্মৃতি, ঠাট্টা মসকরা এসব দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে চায় সে। কিন্তু সেই একই অবস্থা। পাথরের মূর্তি। এই কলংকজনক ঘটনা ঘটার পর প্রথম দু'এক দিন পত্রিকায় জোরালো ভাবে দু'একজন বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ বুদ্ধিজীবী আর কলামিস্টরা রহস্যজনকভাবে নীরব হয়ে গ্যাছে। পান থেকে চুন খসলে যেখানে দেশের প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্পটেই জানার দিয়ে দেয় যে কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, সেই প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ ব্যাপারে নিশ্চপ। সরকারের সাথে তাল মিলিয়ে বুদ্ধিজীবীরা যেখানে শেয়ালের মত হুক্কা হুয়া করত, সেই শেয়াল বুদ্ধিজীবী হুক্কা হুয়া তো দূরের কথা, টু শব্দটি নেই। সরকার বা তার ধামাধরা রামছাগল গুলো কথা বাদ দেওয়া যেতে পারে কারন ঘটনাটা ঘটিয়েছে প্রধান মন্ত্রীর সোনার ছেলেদের মধ্যে থেকে কয়েকজন। কিন্তু বিরোধী দল? সে বিরোধীদল কথায় কথায় হরতাল দেয়, যার নেত্রী আজকে ধাক্কা দেয় তো কালকে টোকা দেয় তো পরশু দেয় ফু। এতেই নাকি সরকার প্রধান এবং তার চামচাগণ তল্পিতল্প সহ বিদেশে আশ্রয় নেবে। সেই বিরোধী দল আর তার ছাত্র সংগঠনের খুব একটা উচ্চবাচ্য নেই এ ব্যাপারে। বিরোধী দলের নেত্রী মনে হয় তার দলের সোনার ছেলেদের ধিক্কার দিয়েছেন ওদের ব্যর্থতার জন্য। সরকারি দলের দামাল ছেলেরা এত সুন্দর একটা কাজ করল আর তোমরা করতে পারলে না? তোমরা কি বসে বসে দূর্বা ঘাস ছিড়েছ?

শালা অমানুষ, সব অমানুষ, ইবলিশের প্রেতাত্মা। ঢাকার রাস্তায় দুপুর রোদে হাঁটে আর বিড় বিড় করে দ্রোহী। মাঝে মাঝে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। থাকত যদি একটা স্টেনগান তাহলে সব গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিত সে। কিন্তু স্টেনগান তো দূরের কথা এটা পেন্সিল কাটার ছুড়ি পর্যন্ত তার কাছে নেই। আর থাকলই বা। ধরা যাক, দৈবযোগে সে একটা স্টেনগান পেয়েই গেল, তাহলে কি সে পারবে, সংসদ ভবনে গিয়ে তিনশ নির্বাচিত ভাত্তরা আর ত্রিশ সংরক্ষিত বেশ্যাদের বুক ঝাঝরা করে দিতে। আরে মন্ত্রী এম পি বাদ, এখন যদি ধর্ষণের সেঞ্চুরী যারা করেছে, তাদের কেউ সামনে এসে বলে মিয়া বাই, আপনে নাকি সব শ্যাষ কইরা দিবেন। দেহি আপনে কি করবার পারেন। আমার কোন চুলডা ছিড়বার পারেন। পারবে না সত্যিই দ্রোহী কিছু পারবে না। আসলে অন্যের দোষ দিয়ে লাভ নেই। সে নিজে হচ্ছে একটা বড় হিপোক্র্যাট।

পুতুলের ব্যাপারে কোন ডাক্তার ছেলে নাকি প্রাস্তাব দিয়েছে। এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য লিপির বাসায় যাচ্ছিল দ্রোহী। পথে ফারুকের অফিস চোখে পড়ে। আর দেখা হয় কি না হয় তার ঠিক নেই, এই সুযোগে একবার দেখা করেই যাওয়া যাক।

কার সাথে যেন ফোনে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করছিল ফারুক। দ্রোহীকে দেখে ফোনালাপ সংক্ষিপ্ত করে।

X ভালই হয়েছে, তুই এসেছিস। তা কবে যাচ্ছিস।

X দেখি, আগামী এক দুই সপ্তাহের মধ্যেই হয়ত।

X যাক ভালই হলো, আগামী মাসের পনের তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে নিউইয়র্ক যাচ্ছি। ওখান থেকেই আমি নাই- হয়ে যাব। কি বলিস?

X তুই কি সিরিয়াস?

X আলবৎ সিরিয়াস। দেখছিসনা? দেয়ালে ঝুলানো নেতার ছবির দিকে ইঙ্গিত করে ফারুক।

X দল বদল কমপ্লিট। এখন মানে, মানে কেটে পড়তে পারলে বাঁচি।

X বলিস কি তোরা দেশ ছাড়লে, দেশের মানুষগুলো কাকে চাঁদা দেবে? ধর্ষিতা হবে করা?

X লজ্জা দিস না দোস্ত। তুই যে বললি তোরা দেশ ছাড়লে। এই তোরার মধ্যে আমি নেই। এতদিন ছিলাম। পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছিল। আর ধর্ষণের কথা বলছিস? আই হেইট দোস্ত বাস্টার্ডস। পুলিশের চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

X কে?

X কে আবার সেঞ্চুরিয়ান মতিন।

X তুই চিনিস না এর মধ্যে দেখেছিস?

X দেখব না কেন? রোজই তো সন্ধ্যার পর বাংলামটরে ড্রাগন বারের দোতলায় বসে। বেহেড মাতাল হয়ে, সবাইকে গালি গালাজ করে যাচ্ছে তাই। শুয়োরের বাচ্চা।

X আরও কিছুক্ষণ এ বিষয় ও বিষয়ে আলাপ হয় দু'বন্ধুতে। একসময় বিদায় নেয় দ্রোহী। বিদায় নিয়েও আবার দরজা থেকে ফেরত আসে সে।

X দোস্ত একটা বিপদে পড়েছি।

X কি বিপদ?

X আমাদের মহল্লায় কিছু বাজে ছেলেপেলে ক'দিন ধরে খুব বিরক্ত করছে চাঁদার জন্য।

X ও তাই। ঠিক আছে, আমি তোদের ওয়ার্ড কমিশনারকে এখনই ফোন করে বলে দিচ্ছি। ছেলে গুলোর নাম জানিস?

X আরে না না। কমিশনার টমিশনার লাগবে না। তার চেয়ে বরং এক কাজ কর। তোর কাছে তো অনেক পিস্তল আছে। আমাকে একটা পিস্তল দে ধার হিসেবে।

X তুই কি পাগল হয়ে গেছিস? এসব খুন খারাবির মধ্যে -- --

X খুন করতে যাব কোন দুঃখে। জাস্ট একটু ভয় দেখানো আর কি।

X তার দরকার কি আমি তো -

X তুই খামোখা ভয় পাচ্ছিস। মাল থাকলে দে, না থাকলে খোদা হাফেজ।

X মাল থাকবে না কেন? দাঁড়া তোকে লাইসেন্স করা জিনিস দিচ্ছি। তা পিস্তল চালানো জানিস নাকি?

X হ্যাঁ। এল এ-তে একবার শুটিং ক্লাবে মেম্বার হয়েছিলাম। তখন শিখেছি।

ফারুকের কাছ থেকে পিস্তল নিয়ে কোমরে গুঁজে ইন করা টি-শার্ট উপরে তুলে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে দ্রোহী। হাঁটার সময় টের পায় সে, বেশ বড় একটা পরিবর্তন ইতিমধ্যে ঘটে গ্যাছে। তার মধ্যে। কে যেন বলছে যুদ্ধ, যুদ্ধ শান্তির জন্য যুদ্ধ। আর সেই সাথে দুড়ুম দুড়ুম যুদ্ধের দামামা। বোনের বাসায় যাবার পরিকল্পনাটা আপাততঃ স্থগিত করে সে। হাবিবকে এখন তার ভীষণ দরকার।

ফারুকের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নেবার পরদিন সন্ধ্যায় দ্রোহী হাজির হয় বাংলামটরের সেই ড্রাগন ক্লাবে। সঙ্গে হাবিব। দ্রোহী বারে যাবে শুনে বেশ আশ্চর্য হয়েছিল হাবিব। একের পর এক প্রশ্ন করে মূল উদ্দেশ্যটা জানতে চাইছিল। কিন্তু দ্রোহীর ওকে সাতপাঁচ বুঝিয়ে একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে এসেছে। বারের দোতলায় উঠে এক কোণায় টেবিলে ওরা দু'জন বসে।

X কি খাবি বল? হাবিবকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করে দ্রোহী।

X আমি কোন ড্রিংক নিব না। ড্রিংক করলে গাড়ি চালাতে পারি না। তুই কর, আমি তোকে সংগ দিচ্ছি।

X আমিও খাব না, দোস্ত। বাংলাদেশে নাকি ক্লাব বা বারের ছড়াছড়ি। একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে এলাম।

আমরা বরং ---- অর্ডার করি, কি বলিস।

X ঠিক আছে। তবে বিলটা কিন্তু আজকে আমি দেব। শর্তারোপ করে দেয় হাবিব।

X আচ্ছা চলো সহী হ্যায়। আজ কা সাম মেরা ইয়ার হাবিবকা নাম। হো হো হো।

X দে দে একটা বিড়ি দে। মধ্যমা আর বৃদ্ধাংগুলির সংঘর্ষে চুটকি বাজিয়ে হাবিবের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় দ্রোহী।

বাইরের থেকে ছোট মনে হলেও বারের ভেতরটা বেশ প্রশস্ত। বারটা চার আসনের। টেবিল তিন সারিতে সাজানো। প্রতিটা টেবিলের মধ্যে দূরত্ব বেশ। স্পিকারে জাগজিৎ সিং-এর গজল, স্বল্প পাওয়ারের লাল-নীল বাতি আর ঘরময় দলবদ্ধ ভাসমান সিগারেটের ধোঁয়া। পরিবেশটা অস্বাস্থ্যকর হলেও মাতালদের জন্য মহোপযোগী। দ্রোহীর চোখ রাডারের মত ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলো স্বল্পতা আর সিগারেটের ধোঁয়ায় বোঝা যাচ্ছে না এখানে আদৌ সেঞ্চুরিয়ান মতিন আছে কি নেই। তবুও আশা ছাড়ে না দ্রোহী। আপেক্ষা করতে থাকে সে।

হাবিব বক বক করছে, তার আর নাহারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আমেরিকায় গিয়ে তাদের থেকে যাওয়ার ইচ্ছ নেই। আরও কতকিছু। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই --- হার মধ্য দিয়ে উত্তর দিচ্ছে দ্রোহী।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। মাতালদের কোলাহলে একটু একটু করে বাড়ছে। কোলাহলের মাত্রা বাড়তেই থাকবে বার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত। অপেক্ষা করছে দ্রোহী। ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠছে ক্রমশঃ।

অপেক্ষার অবসান ঘটে রাত সাড়ে বারটায়। কোণার এক টেবিল থেকে উচ্চস্বরে রা করে ওঠে এক মাতাল। জড়ালো কণ্ঠে চেচিয়ে ওঠে মাতালটা।

X আই অ্যাম দ্র কিং। আই অ্যাম কিং মতিন। কোন শা-লা আমার গায়ে ফুলের টোকা দেয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

X মতিন ভাই, চুপ করেন। থামেন তো। মতিনের সঙ্গীরা তাকে থামানোর চেষ্টা করে।

কিন্তু ততক্ষণে মতিন কন্ট্রোলের বাইরে। কোন এক পত্রিকার সম্পাদকের উদ্দেশ্য বিষোদগার করতে থাকে সে। বেচারা সম্পাদক ধারে কাছে নেই। থাকলে লজ্জায় মাটির নীচে আশ্রয় নিত।

সঙ্গীদের যথাস্থানে রেখেই চলতে চলতে বাইরের দিকে অগ্রসর হয় মতিন।

হাবিবকে ইশারা করে দ্রোহী - ওঠ।

X দ্রোহী, আমি বুঝতে পারছি না ----। আমতা আমতা করে হাবিব।

X বুঝবি পরে, চল এখন।

মাতাল মতিনের পিছু পিছু ওরা দু'জন সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। স্বঘোষিত কিং বার থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে ইস্কাটন রোড ধরে হাঁটতে থাকে। নিরাপদ দূরত্ব রেখে ওরা দু'জনও পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকে।

বিপদ বিপদ গন্ধ পাচ্ছে হাবিব। দ্রোহীর চেহারার দিকে তাকিয়ে সেই বিপদের মাত্রাটা বোঝার চেষ্টা করছে। দ্রোহীকে সে ন্যাংটা কাল থেকে দেখছে, কিন্তু এ যেন সে দ্রোহী না। সম্পূর্ণ অন্য আর একজন। প্রতিহিংসার আগুন কামারশালার উনুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে ওর চোখ দুটোতে। সামনের ওই ছেলেটিকেও সে চিনতে পেরেছে। পত্রিকায় ফলাও করে হারামজাদার ছবি ছাপা হয়েছিল। তাই মওকা যখন মিলেছে, একটু ধোলাই দিলে খারাপ হয় না। তাছাড়া দ্রোহীকে এখন আর ফেরানো যাবে না। তাই সে চেষ্টাও হাবিব করে না। শুধু বন্ধুর সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে থাকে সে। মিনিট পাঁচেক হাটার পর মতিন বাঁ দিকে দিলু রোডে ঢোকে পড়ে। কারেন্টও চলে যায় ঠিক সেই মুহূর্তে। হাবিবকে পেছনে ফেলে দৌঁড়ে দিলু রোডে ঢোকে দ্রোহী। চাঁদের আলোয় ঠিক দেখতে পারা যায় মতিনকে। একটা লাইটপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে প্যান্টের চেইন খোলার চেষ্টা করছে সে। কিছু বুঝতে দেয় না প্রতিপক্ষকে, কলার ধরে এক ধাক্কায় রাস্তা ঘেঁষা এক বাড়ির দেয়ালে নিয়ে ঠ্যাকায়।

X কোন্ কোন্ মাদার চোদ আমার কলার ধরে রে ----?

X চোপ। এক হাতে গলায় চাপ দিয়ে ধরে দ্রোহী মতিনের। অন্য হাতে পর পর দু'বার ঘুষি মারে চেহারা লক্ষ্য করে। অন্ধকারে বুঝতে পারে না দ্রোহী, মতিনের হাতে ইতিমধ্যে শোভা পাচ্ছে ধারালো ছোরা। চাঁদের আলোয় একবার মাত্র ঝিলিক দিয়ে ওঠে। দ্রোহীর বাঁ বাহুতে ধাতব বস্তুটির অগ্রভাগ বিঁধে যায়। খটাস করে একটা আওয়াজ হয় হাঁড়ের সাথে ধাক্কা খাওয়ায়।

দ্রোহীর মনে হয় একটা আগুনের ফুলকি যেন তার বাহুতে এই মাত্র সেঁধে গেল। তীব্র যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে সে। বাঁ হাতটা দুর্বল হয়ে আসছে, মাথাটা চরকীর মত ঘুরছে। পায়ের নীচটাও টলমল। ডান হাত দিয়ে মতিনের ছোরাসহ হাতটা শক্ত করে ধরে সে।

ঢং ঢং ঢং। বিপদের পাগলা ঘন্টি বাজছে। কাম অন দ্রোহী। ভেতরের দ্রোহী চিৎকার করে ওঠে। মুনি-ঋষির যুগ চলে গ্যাছে। তোমার মায়ের কষ্টের কথা মনে পড়ে না দ্রোহী? তোমার মায়ের মত আরও হাজার হাজার মায়েরা আঁদরের ছেলেকে বিদেশ পাঠায় একটু সুখের জন্য। কারণ এখানে সুখ নেই। সব সুখ ভোগ করে এই নরপিশাচরা। হাসপাতালের সেই নার্স মেয়েটার কষ্টের কথা মনে পড়ে দ্রোহীর। তোমার বর্ষার কথা মনে পড়ে না? বর্ষা! তোমার স্বপ্ন, তোমার পৃথিবী।

X কিন্তু

X কোন কিন্তু না। কাউকে না কাউকে তো শুরু করতেই হবে। কাম অন।

যুগপত মতিনের কলার আর হাত ছেড়ে দিয়ে ছিটকে কয়েক গজ পিছিয়ে যায় দ্রোহী। ইতিমধ্যে হাবিবও এসে গ্যাছে। কি যেন বলছে ও চিৎকার করে। শুনতে পায় না দ্রোহী। ডান হাত কোমরে চলে গ্যাছে। আহত হাতের সাহায্য নিয়ে সেফটি ----- অন করাও হয়ে যায় হাবিব কিছু বুঝে ওঠার আগেই। ঠুস ঠুস ঠুস। পরপর তিনবার আওয়াজ হয়।

X এ তুই কি করলি?

X অ্যা? কি করলাম। সারা শরীর কাঁপছে দ্রোহীর। কম্পিত হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ে। এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে হাবিব। সেই সোথে দ্রোহীর বাহুতে বিদ্ধ ছোরাটা দেখতে পায় সে। এক টানে বিদ্ধ অস্ত্রটা দ্রোহীর বাহু থেকে ছুটিয়ে নেয়। চারদিকে আলোকময়ও হয় সেই সাথে। কারেন্ট এসে গ্যাছে। দ্রোহীর হাত ধরে হ্যাচকা টান মারে হাবিব। দৌড়া দোস্ত, গাড়ির দিকে।

X কারো কোন বাঁধা বিপত্তি ছাড়াই ওরা গাড়িতে এসে পৌঁছে। হাবিবের গাড়ি ছুটে চলে পুরনো ঢাকার দিকে।

X হাবিব, তোদের টিকিট তো কাটা হয়ে গ্যাছে, না?

ইতিমধ্যে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে দ্রোহী। যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ করা শেষ।

X ক্যানো? বন্ধুকে পাল্টা প্রশ্ন করে হাবিব।

X তুই কালকের মধ্যে ফ্লাই করবি। ঠিক আছে?

X আর তুই?

X আমিও যাব। তবে কালকে না। দু'একদিন বাদে। বর্ষাকে এভাবে রেখে আমি যেতে পারি না, বুঝতেই পারছিস।

X পাগল আমি না তুই। একটা বার ভেবে দেখ। ঢাকা শহরে কেউ আমাকে চেনে না। কিন্তু তোকে চেনে। পুলিশ যখন আলামত খুঁজবে, তখন অনেক কিছুই হয়ত পাবে। বিশেষতঃ তোর এই ট্যাক্সি। অনেকেই হয়ত আমাদের দেখছে। সেই সব চাক্ষুস সাক্ষীদের বর্ণনা অনুযায়ী তোকে লোকেট করা পুলিশের পক্ষে খুব সহজ হতে। কিন্তু আমাকে সম্ভব না।

X না দোস্ত, তোর যুক্তি আমি মেনে নিতে পারলাম না।

X খরংঃবহ, হাবিব। তোকে শুধু তোর চিন্তা করলেই চলবে না। নাহারের দিকটাও ভাবতে হবে। তোদের জীবনে যে নতুন অতিথি আসছে তার কথা, লঁংঃ ঃযরহশ ধনড়ঁঃ রঃ.

X কিন্তু হঠাৎ করে কালকেই ----

X আই ডেন্ট নো হাউ ইউ ডু ইট, বাট ইউ গট টু ডু ইট।

X ইসরে, তোর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, না? আগে হসপিটালে চল।

X না, না। তুই এই মুহূর্তে এইখানে আমাকে নামিয়ে দিবি। তারপর সোজা গাড়ি গ্যারেজে।

পল্টনের মোড়ে গাড়ি থামাতে বলে দ্রোহী। গাড়ি থেকে নেমে স্কুটারে ওঠার পূর্ব মুহূর্তে পেছন থেকে হাবিবের ডাক আসে।

X দ্রোহী।

ফিরে তাকায় দ্রোহী।

ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে দ্রোহীকে জড়িয়ে ধরে হাবিব।

X বিদায় বন্ধু। ভাল থাকিস।

X হ্যাঁ বিদায়। আমি ভাল থাক। তুইও ভাল থাকিস।

ভট ভট ভট স্কুটার যাত্রা করে দ্রোহীকে নিয়ে।

চোখ মুছে গাড়ি স্টার্ট দেয় হাবিব। হা হা করে ওঠে তার ভেতরটায়। হু হু শব্দে, প্লাবনের মত তেড়ে আসছে অশ্রুর প্রপাত। সেই প্রপাত থামানোর কোন চেষ্টা হাবিব করে না।

॥ তেইশ ॥

পরদিন সকালের সংবাদ পত্রগুলোতে বড় করে হত্যার সংবাদ ছাপা হয়। রাজধানীতে ডাবল মার্ডার। গতকাল রাতে রাজধানীর দিলু রোড়ে ছাত্র নেতা মতিনকে কে বা কারা গুলি করে হত্যা করেছে। প্রায় একই সময়ে রামপুরা টিভি ভবনের কাছে গুলিবিদ্ধ হয় ওয়ার্ড কমিশনার কালা ফারুক। পুলিশ এই দুই হত্যাকান্ডে একই সুত্রে গাঁধা বলে ধারণা করছে। কারণ দিলু রোড়ে মতিনের মরদেহের পাশে যে পিস্তল পাওয়া গ্যাছে তা কালা ফারুকের নামে লাইসেন্স করা। তদন্তের স্বার্থে এর বেশী কিছু জানাতে পুলিশ অপারগতা প্রকাশ করেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেদিনের বা পরদিনের বা তারও পরদিনের পত্রিকায় এই হত্যা সংক্রান্ত খবর ফলাও করে ছাপা হতে থাকে।

প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পল্টনের বিশাল সমাবেশে সন্ত্রাস দমনের অংগীকার পূর্ণব্যক্ত করেন। সন্ত্রাসীদেরকে আঠারো হাত মাটির নীচে থেকেও যে আলগোছে তুলে আনা হবে, এই হুমকি

দিতেও তারা পিছপা হন না। বিরোধীদলের নেত্রীও কম যায় না। সরকারি গুন্ডারা সব চেটে পুটে খাচ্ছে (আফসোস তার দলের গুন্ডারা এঁটোটাও পাচ্ছে না)। এই জালিম সরকারের আর এক মুহূর্তও ক্ষমতায় থাকার অধিকার নাই। গত নির্বাচনে যে বিজয় তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা সে আর মাত্র একটা ধাক্কা অথবা টোকা অথবা ফুৎকারের বিনিময়ে উদ্ধার করবে ইনশাল্লাহ। বুদ্ধিজীবীরাও সমস্বরে হুক্কা হুয়া করে ওঠে। এভাবে স্বাধীনতার পক্ষের ধর্ষক, হত্যাকারী চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজদের হত্যা করলে স্বাধীনতার বিপক্ষের ধর্ষক আর খুনীরা তাদেন অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পোঁছে যাবে বিনা বাধায়। সুশীল সমাজের সচেতন নাগরিক হিসেবে তারা তা মেনে নিতে পারে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্রোহী অবশ্য এসবের কিছুই জানতে পারে না। সে রাতে রক্তাপ্লুত অবস্থায় কোন মতে ঘরে আসতে পারে। দ্রোহীর এ অবস্থা দেখে বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে যায়। ধ্রুব সেদিন ঘরেই ছিল। ধ্রুব যখন হাসপাতাল আর পুলিশ পুলিশ করছিল তখন দ্রোহী কোনমতে বোঝাতে সক্ষম হয় যে থানা, পুলিশ বা হাসপাতাল করলে ভীষণ বিপদে পড়বে সে। যা করার বাসাতেই করতে হবে। তার পর পরই জ্ঞান হারায় সে।

বাংলাদেশের পুলিশ ঘুষ খায়, হাজতে আসামী ধর্ষণ করে, চাঁদাবাজদেন কাছ থেকে চাঁদা তোলে অথবা খুন করে পানির ট্যাংকে লাশ গুম করে রাখে। এ ধরনের নিন্দা যারা করে তাদের মুখে চুনকালি মেখে ঢাকা মহানগরী পুলিশ বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে সেঞ্চুরিয়ান মতিন এবং কালা ফারুকের প্রকৃত হত্যাকারীকে ধরতে সক্ষম হয়।

সকালে সূর্য তখনও উঠি উঠি করছে, রাস্তায় ডিপ টিউওয়েলে অনবরত হাতল চাপার আওয়াজ কচক কচক, গলির মোড়ের পুরির দোকানদার কেবল তার কয়েক সপ্তাহের বাশি তেল কড়াই বোঝাই করে উনুনে দম দিচ্ছে। ঘরের মধ্যে বড় ভাই ধ্রুব আর অপরিচিত কয়েক জনের কণ্ঠ শুনে ঘুম ভাঙ্গে দ্রোহীর। পিট পিট করে তাকানোর চেষ্টা করে প্রথমে। ভাল দেখতে পায় না, পিচুটি পড়ে চোখ প্রায় বন্ধ। আস্তে আস্তে সব পরিস্কার হয়। ঘর ভর্তি পুলিশ। খুব বড় করে অনেক খানি বাতাস নিয়ে শ্বাস ছাড়ে দ্রোহী, সেই সাথে ঘরময় চোখ বোলায়। দেখে নিতে চায় সে প্রাণভরে এই ঘরটা, এই ঘরের যা কিছু আছে সব। চিৎকার করতে করতে পুতুল ছুটে আসে - মামা ও মামা, নানু যেন ক্যামন করছে। জলদি আসো। দ্রোহীকে পুলিশের জিম্মায় রেখে ছিটকে বেরিয়ে যায় ধ্রুব। লক্ষণ দেখে বুঝতে পারে হার্ট অ্যাট্যাক হয়েছে মায়ের। অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করে আবার যখন দ্রোহীর ঘরে আসে ধ্রুব তখন, হাত কড়া পরানো হয়ে গ্যাছে। কোন ওজর আপত্তি কানে তোলে না দাঁয়িত্বরত পুলিশ। এ্যাম্বুলেন্স আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার মত সময় তাদের হাতে নেই।

পুলিশ পরিবেষ্ঠিত হাত কড়া পরা দ্রোহী মায়ের নিশ্চল দেহটা একটু ছুয়ে দেয় মাত্র। একে একে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠোন পিরিয়ে পুলিশ ভ্যানের দিকে অগ্রসর হয়। একসাথে এত মানুষের আগমন দেখে ডাস্ট বিনের পাশে শুয়ে থাকা নেড়ি কুত্তাটা আড়মোড়া ভেঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। সামনের মুদির দোকান, ফার্মেসী, পুরীর দোকান, উপচে পড়া ডাস্টবিন, ক্ষয়ে যাওয়া বাড়ির দেয়াল সব সবকিছু এক নজরে প্রাণ ভরে দেখে নেয় সে।

দ্রোহীর নামে কোন দেয়াল লিখন হয় না। তার মুক্তি চেয়ে কোন মিছিল মিটিং, পিকেটিং হয় না, থানা হাজতে বসেই মায়ের মৃত্যুর সংবাদ শোনে সে।

অসম্ভব দ্রুততার সাথে বিচার কাজ চলতে থাকে। দু'চারদিন পর পরই কোর্টে যেতে হয় দ্রোহীকে। কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ দু'পক্ষের উকিলের তর্কাতর্কি শোনে। মাঝে মাঝে দু'একটা প্রশ্নের উত্তরও তাকে দিতে হয়। সাধারণত মাথা নিচু করেই দাঁড়িয়ে থাকে দ্রোহী। দর্শকের সারিতে বসা প্রিয়জনের করুণ মুখগুলো দেখতে তাঁর ভাল লাগে না। সাক্ষীরা আসে, উইটনেস বক্সে দাঁড়িয়ে সত্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। কেউ বা সরাসরি দ্রোহীকে শনাক্ত করে কেউ বা শনাক্ত করতে পরে না। তবে সার্বিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে দ্রোহীর বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। হাবিবের নামেও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়েছে। দ্বিতীয় আসামীর অনুপস্থিতিতেই তার বিচার কার্য চলছে।

শুনানির দিন অনেকেই আসে। ক'দিন হলো মেঘলা অবশ্য আসতে পারে না। দুধের বাচ্চা নিয়ে আদালতে আসাটা সমীচীন না। একদিন দর্শক সারীতে সেই নার্স মেয়েটিকে দেখা যায়। পাশে বসা এক যুবক। সম্ভবতঃ লোকমান। মালয়েশিয়া থেকে ফিরেছে তাহলে ছেলেটা। সবাই আসে শুধু বর্ষা আসে না। প্রতিবার হাজিরা শেষে যখন প্রিজন ভ্যানে ওঠে দ্রোহী তখন অন্য সব আসামীর মতই ছোট জানালা দিয়ে শেষ বারের মত আপনজনদের করুণ মুখ গুলো দেখে নেয় সে। শেষ মুহূর্তেও তন্ন তন্ন করে খোঁজে একটা মুখ। খুঁজে পায়না কোথাও।

বিচার কাজ দ্রুত শেষের দিকে চলে আসে। শেষ দিনে দ্রোহীর সুযোগ আসে আত্মপক্ষ সমর্থন করার। গলা খাকারী দিয়ে শুরু করে দ্রোহী -

মাননীয় আদালত, আপনি কি কখনও স্বপ্ন দেখেন? ঘুমিয়ে না জেগে স্বপ্ন। আমি দেখতাম। জেগে স্বপ্ন দেখতাম বলেই আমার স্বপ্নে কোন মিথ্যা নেই, অবাস্তব বা অশরীয় কিছু নেই। আমার স্বপ্নে ছিল ছোট একটা ঘর, মনের মত একজন সঙ্গিনী, ছোট ছোট শিশু। আমি স্বপ্ন দেখতাম এমন একটা ঘরের, যে ঘরে ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্যের অপ্রতুলতা থাকলেও আছে ভালবাসার, সত্যের আর সুন্দরের বাড়াবাড়ি রকমের প্রতুলতা। এই দেশ, বা দেশের সমাজ ব্যবস্থা বা আইন আমাকে সেই স্বপ্নের ঘর বাঁধার কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি। সেটা অর্জন করতে হয়েছে আমাকে অনেক সংগ্রাম করে। রক্ত দিয়ে সংগ্রাম নয় ঘাম ঝড়িয়ে সংগ্রাম। আমি যখন সেই স্বপ্ন ঘেরা ঘরের দোরগোড়ায় ঠিক তখনই এক দল নরপশু তছনছ করে দেয় সেই ঘর। স্বপ্নগুলো ভেঙ্গে যায় আমার।

মানুষ আমি, অতি সাধারণ মহামানব নই। ভেতরে আগুন জ্বলে আমার দাউ দাউ করে। একদিন সুযোগ পেয়ে যাই আমি সেই আগুন নেভানোর। ণবং, সু খড়ৎফ, ও ফরফ শরষষ ঃযধঃ নধংঃধৎফ. দেশ বা আইন যা পারেনি বা করেনি, আমি তা পেরেছি। সে দৃষ্টি কোন থেকে আমি দোষী। রাষ্ট্র আমাকে যে সাজা দেবে তা আমাকে মেনে নিতে হবেই। তবে ণড়ঁৎ ঐড়হড়ঁৎ, আমি শুধু একজনকে খুন করেছি। কালা ফারুককে আমি খুন করিনি। একথা সত্য যে, ওর কাছ থেকে ওর পিস্তলটা আমি চেয়ে এনেছিলাম আগের দিন। আমার এই স্টেইটমেন্টের সপক্ষে কোন প্রমাণ আমি দিতে পারব না। তবে যে এক খুনের কথা স্বীকার করতে পারে সে দু'খুনের কথাও স্বীকার করতে পারে। ফারুক বাঁচাতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পারেনি। পুলিশ যেমন ঐ বাস্টার্ডটার খুনীকে ধরতে পেরেছে, ইচ্ছা করলে তেমন করেই ফারুকের খুনীকেও ধরতে পারবে। এ ব্যাপারে পুলিশের ইচ্ছা শক্তিই বড় কথা। আর একটা ব্যাপার, হাবিবকেও এই মামলার আসামী দেখানো হয়েছে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, যে হাবিব এই খুনের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিল না। সে শেষ মুহূর্তেও বাঁধা দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমি তখন আমাতে ছিলাম না। আমি মহামান্য আদালতের কাছে অনুরোধ করব হাবিবকে এ মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। ঞযধহশং ধষষ, ুড়ঁৎ ঐড়হড়ঁৎ.

এতক্ষণ গালে হাত দিয়ে দ্রোহীর বক্তব্য শুনছিলেন বিচারক। বক্তব্য শেষ হতেই নড়ে চড়ে বসেন। পাশে রাখা চশমাটা চোখে দিয়ে বলেন -

আদালত আজকের মত মুলতবী করা হলো। এই মামলার শুনানি শেষ। আগামী সাত তারিখে এই এজলাশে মামলার রায় ঘোষণা করা হবে।

॥ চব্বিশ ॥

সেদিন কোর্ট থেকে এসে লম্বা একটা ঘুম দেয় দ্রোহী। ঘুমিয়ে খুব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখে। পুতুলের বিয়ে হচ্ছে। কি যে অপরূপ সুন্দরী লাগছে মেয়েটাকে। এই তো সেদিন ন্যাশনাল হাসপাতালে জন্ম নিল পুতুলের মত একটা শিশু। পুতুল, তুলতুল কত্ত যে আদরের। সেই আদরের পুতুল এখন বিয়ের কনে। পুতুলের বর হচ্ছে সেই হাবাগোবা ডাক্তার মাহতাব। সেই আগের মতই নার্ভাস ছেলেটা। চিনির সরবত বলে মেয়েরা মরিচ গোলা সরবত ধরিয়ে দিল, আর ছেলেটা তার সবটুকু ঢুক ঢুক করে গিলে ফেলল। কি বোকা ছেলেরে বাবা। ছি ছি ছি হাসির রোল ওঠে বিয়ের আসরে। হি হি হি ---- ঘুম ভেঙ্গে নিজের হাসির শব্দ নিজেই শুনতে পায় দ্রোহী। বাইরে মেস্ট্রিদের খট খট পদধ্বনি, লোহার ফটক খোলার বা আটকানোর শব্দ। মাথার ওপর কম পাওয়ারের বিজলি বাতি। বিছানা ছেড়ে ওঠে না দ্রোহী। পূর্ববত কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে স্বপ্নের কথা ভাবে। এক স্বপ্ন নিয়ে ভাবতে ভাবতে কত কথা মনে পড়ে দ্রোহীর। সেই ছোট বেলা, সলিমাবাদ গ্রাম, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, সরিষা ক্ষেত, ঝম ঝম বৃষ্টি, আম পড়া, ব্যাঙের ডাক, জোৎস্না রাত, প্রাইমারী স্কুল, গাছতলায় বসে নামতা গোনা। এক সময় গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা, কলেজিয়েট স্কুল, সদর ঘাট লঞ্চ টার্মিনাল, লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া, লেবু পাতা দিয়ে হাত মুখ ঘষা, মধুমিতা বা অভিসারে সিনেমা দেখা। একসময় এগুলো ছেড়ে সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দেওয়া। সমুদ্র সৈকত পাথুরে পাহাড়, ইউনিভার্সিটি, কার্জ, অর্থ উপার্জন, গ্র্যান্ডি ক্যানিয়ন, লেইক টাহো, স্পট লেক, ডেথ ভ্যালী, বিত্তা রেখার লেক, আর কতকি। পৃথিবীটা খুব সুন্দর আর বিশাল। এই বিশাল আর সুন্দর পৃথিবীর কতটুকুই বা সে অবলোকন করতে পেরেছে। বিশাল পৃথিবীর সৌন্দর্য অবলোকন না করতে পারলেও শুধুমাত্র শ্বাস প্রশ্বাস নেবার মধ্যেও একটা আলাদা আনন্দ আছে। বেঁচে থাকার আনন্দ। সেন্ট্রির ডাকে দ্রোহী বাস্তব জগতে ফিরে আসে। শিকের ফাঁক দিয়ে লোকটা একটা চিঠি ধরিয়ে দেয়।

বর্ষার চিঠি। সেই পরিচিত হাতের লেখা, সেই পরিচিত গন্ধ। ভেতরে ভেতরে পুলক বোধ করে দ্রোহী। কম্পিত হাতে খাম ছিড়ে চিঠিটা বের করে পড়তে শুরু করে।

প্রিয় দ্রোহী,

ভালবাসা নিও। আবাক লাগছে তাই না? তোমার শত অনুরোধ সত্ত্বেও কোনদিন তোমাকে তুমি করে বলিনি। আর আজকে? দেরিতে হলেও তোমার একটা অনুরোধ সম্ভবতঃ রাখলাম। ছয় মাস মাদ্রাজ আর সিঙ্গাপোরে কাটিয়ে আসলাম। এসে তোমার কথা শুনলাম, পত্রিকায় পড়লাম। পৃথিবীটা খুব নিষ্ঠুর একটা জায়গা তাই না? কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল এখন ভাবতেই আবাক লাগে। আমি অবশ্য এ নিয়ে ভাবতেও চাই না। আমি বাঁচতে চাই। পাপ আর অনাচারে ভরা পৃথিবীতে যৎসামান্য হলেও সত্য আর সুন্দর লুকিয়ে আছে। সেই সত্য আর সুন্দরের জন্য হলেও আমি বাঁচতে চাই। তুমিই আমার সেই সত্য আর সুন্দর। এই চিঠিটা যখন পাবে, ততদিন হয়ত আমার বিয়ে হয়ে গ্যাছে টেলিফোনে। ছেলে থাকে নরওয়েতে। আমার ভাইয়ের বন্ধু। ছেলেটা আমার অতীত সম্পর্কে কিছুই জানে না। জানবেও না কোনদিন। আর ক'দিন বাদেই আমি নরওয়ের উদ্দেশ্যে উড়াল দেব। পেছনে চিরদিনের মত ফেলে যাব আমার অন্ধকার অতীত, সঙ্গে নিয়ে যাব শুধু একটা প্রদীপ। যে প্রদীপের নাম দ্রোহী। একটা কথা তোমাকে কোনদিন বলিনি, জমিয়ে রেখেছিলাম একটা বিশেষ তিথির জন্য। সেই তিথি আমাদের জীবনে আর কোনদিনই আসবে না। তাই এখনই বলছি। দ্রোহী, আমি তোমাকে ভালবাসি। ভীষণ রকমের ভালবাসি। যতদিন বেঁচে থাকব সেই ভালবাসা এতটুকুও ম্লান হবে না।

বর্ষা

যে চিঠি পেয়ে দ্রোহীর হাতদুটো আনন্দে কাঁপছিল, চিঠি পড়ার পরও সেই হাত দুটো কাঁপছে। তবে আনন্দে নয়, অসহায়ত্বে কম্পিত অসহায় হাত দুটো প্রর্থনার ভঙ্গিতে শূন্যে তুলে ধরে। হে খোদা। আরও কিছু বলতে চায় দ্রোহী, হয়ত বা অভিযোগ জানাতে চায় মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে, কিন্তু পারে না। কার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে সে?

শরীরে এক ফোটা শক্তি অবশিষ্ট নেই। অসম্ভব শীত লাগছে। একটু উষ্ণতা দরকার তার। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে মেঝেতে শুয়ে পড়ে সে। কাত হয়ে হাঁটু ভাজ করে প্রায় থুতনির কাছে নিয়ে আসে। ত্রিরিশ বছর আগে যেমনটা সে শুয়েছিল মায়ের উষ্ণ কোমল গর্ভে। মা-মাগো, আমার যে ভীষণ কষ্ট। প্রার্থনারত হাত দুটো দিয়ে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে দ্রোহী। জেলখানার দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই আর্তনাদ, নিজের কানেই ফিরে আসে। পৃথিবীর কেউ শোনে না সেই আর্তনাদ, কেউ না।

সমাপ্ত

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com